উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ

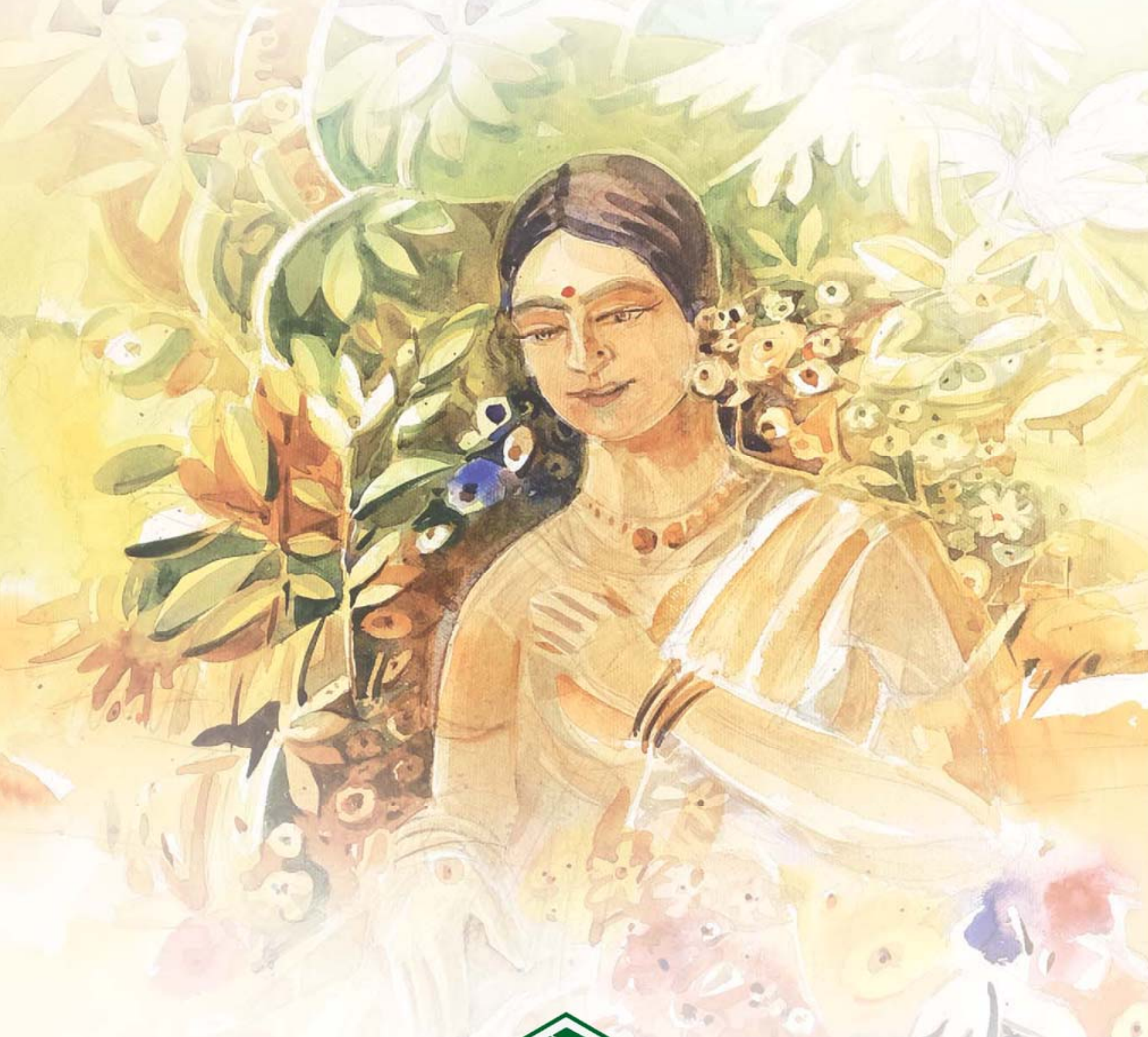

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

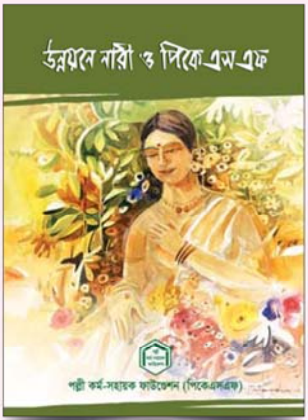

উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ

প্রকাশকাল
অক্টোবর ২০১৮

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

উপদেশক
জনাব মোঃ আবদুল করিম
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক শফি আহমেদ
সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আবু সালেহ কাজল

মহিয়সী নারীদের প্রতিকৃতি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

গ্রাফিক্স
আশুতোষ দেবনাথ

মুদ্রণ
কালার পার্টনার্স
১০/৩ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা
ফোন: ০১৬৮২৩৫৫৯৪৩

সূচি

সম্পাদকের কথা ৫

সভাপতির প্রাথমিক বক্তব্য ৯

স্বাগত বক্তব্য ১৩

প্রবন্ধের সার-সংক্ষেপ ১৯

প্রবন্ধের ওপর আলোচনা ২৩

মুক্ত আলোচনা ২৫

সম্মানিত অতিথির বক্তব্য ৩৩

বিশেষ অতিথির বক্তব্য ৩৬

প্রধান অতিথির বক্তব্য ৩৯

সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ৪৪

পরিশিষ্ট ১ : মূল প্রবন্ধ ৫১

পরিশিষ্ট ২ : সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা ৬২

মেরি ওলস্টোনক্রাফট

১৭৫৯-১৭৯৭

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে পৃথিবীতে সর্বাধিক উচ্চারিত নাম। এক ব্রিটিশ কৃষক পরিবারের সন্তান মেরী পিতার দ্বারাও নিগৃহীত হয়েছিলেন। পিতৃতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে রচিত তার *A Vindication of the Rights of Woman* (১৯৭২) অদ্যাবধি নারীমুক্তি আন্দোলনের আদি বাইবেল হিসেবে স্বীকৃত। অষ্টাদশ শতকে প্রকাশিত এই গ্রন্থ সমাজে অবিস্মরণীয় আলোড়ন সৃষ্টি করে। নারী-পুরুষের সমঅধিকারের উচ্চকণ্ঠ প্রবক্তা।

শফি আহমেদ
সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার
পিকেএসএফ

এই মাত্র ক'দিন আগে নেপালের পাহাড়ি ভূমিতে বাংলাদেশের কিশোরীরা দক্ষিণ এশিয়ার নারী-ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানকে পরাস্ত করে দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। বছর তিনেক আগে পিছিয়েপড়া গ্রামাঞ্চলের কলসিন্দুরের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মেয়েরাও ফুটবলে অনন্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিল। স্বাধীনতার এত্তো বছর পরেও বাংলাদেশের নানান ঘাটতির কথা সবেদনে উল্লেখ করলেও, আমরা যারা বিজয় দেখেছি একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরের গোধূলি বেলায়, তারাও সেদিন অন্যান্য অনেক আকাঙ্ক্ষার মূর্ত রূপ দেখার কথা ভাবলেও, কলসিন্দুরের মেয়েদের এমন অদম্য সাহসের কথা ভাবতে পারিনি। কিন্তু নারীর এমন সাফল্যের কথা সত্যি হলেও, একথা কি বলা যাবে তাদের এগিয়ে যাবার পথটাকে আমরা মসৃণ করতে পেরেছি? এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি ইতিবাচক হবে না। জনসংখ্যার হার যে গতিতে বাড়ছে, তাকে পিছে ফেলে সারা দেশে শহরে-গ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে কিশোরী-তরুণীদের উত্যক্ত করা বখাটে যুবক এবং কিছু সমাজপতির প্রশ্রয় পাওয়া ধর্ষণকারীর সংখ্যা। হায়, এ কী লজ্জা!

এই ২০১৮ সালে নারীদের #MeToo আন্দোলনের অভিঘাতে অনেক পর্দা খসে পড়েছে। বোঝা গেছে, পৃথিবীময় নারীরা কতভাবে কত জায়গায় নির্যাতনের শিকার। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশটির সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তির নারী-কেলেঙ্কারির কথা শুধু কৌতুকময় পরিহাসের যোগান দেয়নি, স্পষ্ট করেছে, এই পুরুষপ্রবল সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান কত নড়বড়ে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রতিমন্ত্রীর মসনদ ভেঙে পড়েছে, বেশ ক'জন লজ্জায় লাল হয়েছেন। #MeToo আন্দোলনের সবচেয়ে বড় লাভটা হল, এর মাধ্যমে প্রতারিত, নির্যাতিত, অসহায় নারী সারা দুনিয়ায় এক ভিন্নধর্মী একতাবন্ধনের সূত্র খুঁজে পেয়েছে। সাহস প্রদর্শনের যে অন্তরায় তাদের মনের দরজায় তালা ঝুলিয়ে রেখেছিল, তারা তা ভাঙতে পেরেছে। সম্প্রতি লেবাননের রাজধানী বৈরুতে অনুষ্ঠিত হয় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। সেখানে নারীরা #ShameOnWho ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একথা বলার চেষ্টা করেছে যে, পুরুষের কামনা নারীর

জীবনকে বিঘ্নিত করে তুলেছে। দু'হাত দিয়ে প্লাকার্ড উঁচুতে তুলে ধরেছে অনেক নারী, আর সেই প্লাকার্ডে লেখা: 'আজ আমি তোমাদের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেব না, যারা আমার ওপর দোষ চাপায়, আজ তাদের মুখোমুখি হব।' বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয়া এইসব প্রযুক্তিনির্ভর অভিযান বাংলাদেশে ধীরগতিতে হলেও মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বোঝা যায়, বাংলাদেশের পরিস্থিতি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতই সকলঙ্ক ও উদ্বেগপ্রবণ।

কলসিন্দুরের মেয়েদের কীর্তি অথবা মাঝে দু'বছরের কম সময়ের বিরতি ছাড়া বাংলাদেশে প্রায় চার দশকের নারী-প্রধানমন্ত্রীত্ব একথা বলার পরিপ্রেক্ষিত কি তৈরি করেছে যে, 'সময় এখন নারীর'? মনের ভেতরের সংশয় ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্নটাকে গাঢ় রঙে দৃশ্যমান করে তোলে। তবুও আশার চেরাগে অনেকটা জ্বালানির যোগান দিয়ে বোধ করি প্রত্যাশার শিখর ছোঁয়ার নেশায় ২০১৮ সালের পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে যে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হল, নারীমুক্তিতে বিশ্বাসী, প্রগতিশীল ও বেসরকারি উন্নয়ন খাতের এক অগ্রবর্তী নেতা এই ঘোষণায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন যে, 'সময় এখন নারীর'। এমন ভাল কথা শুনতেও ভাল লাগে। ওই প্রবন্ধের অন্তঃস্থিত যুক্তি ও তথ্য সম্পর্কে বিতর্ক তোলার অবকাশ প্রায় ছিলই না। এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শ্লোগানেই তো এই কথা বিশ্বব্যাপী ধ্বনিত হয়েছে। তবু ওই কথা থেকে সমাজবাস্তবতার ঠিকানা কিন্তু দূরবর্তী।

ইতোমধ্যেই আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে এই বিশেষ দিবসের শ্লোগান কি হতে পারে, সে বিষয়ে বিভিন্ন নারী সংগঠনের মধ্যে আলোচনার তৎপরতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। স্মরণ করতে পারি, ২০১৮-র শ্লোগানের সমান্তরাল বা সমীপবর্তী আর একটি উদ্যোগের আহবান জানিয়েছিল জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO): নর-নারীর মনোজগতে শান্তি গড়ে তোল (Building Peace in the Minds of Men and Women)। এমন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ইউনেসকোর কাঙ্ক্ষিত এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হল, নারী-পুরুষের সম-অধিকারের দাবিকে মর্যাদা প্রদান।

নারী অধিকার নিয়ে কাজ করছে এমন কয়েকটি সংগঠন আগামী বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শ্লোগান হিসেবে এই সমতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করার জন্য #BalanceforBetter ব্যানারে জনমত সংগঠিত করছে, অনেকটা সমর্থনও তারা আদায় করতে পেরেছে। অথচ এই সম-অধিকারের দাবিতেই ঘোষিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের রীতি। কতটা এগোলো পৃথিবী, কতটা এগিয়ে এলো পৃথিবীর পুরুষকুল, যাদের রক্ষণশীল মনোভাব ও আধিপত্যবাদী আকাঙ্ক্ষার পাথুরে ভূমিতে কাঁদছে নারীরা। না, এখন নারী শুধু কাঁদছে না, তারা ঘরের ভেতর থেকে বাহির পানে বেরিয়ে আসছে, রবীন্দ্রনাথের নন্দিনীর মত। সারা পৃথিবী জুড়ে #PressforProgress নামের বৈশ্বিক আহ্বান উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠছে। এদেশেও নিশ্চয়ই তার অভিঘাত অনুভূত হবে, এমনই প্রত্যাশা করি।

রাজা রামমোহন রায়
১৭৭২/৭৪-১৮৩৩

ভারতীয় রেনেঁসাসের জনক হিসেবে পরিচিত রাজা রামমোহন রায় হিন্দুত্বের গোঁড়ামিমুক্ত ব্রাহ্মসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নারী-পুরুষের সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিশেষত, নারীদের শিক্ষাগ্রহণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং সর্বোপরি, স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু নারীদের সহমরণের যে নিষ্ঠুর প্রথা 'সতীদাহ' হিসেবে পরিচিত ছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

জন স্টুয়ার্ট মিল
১৮০৬-১৮৭৩

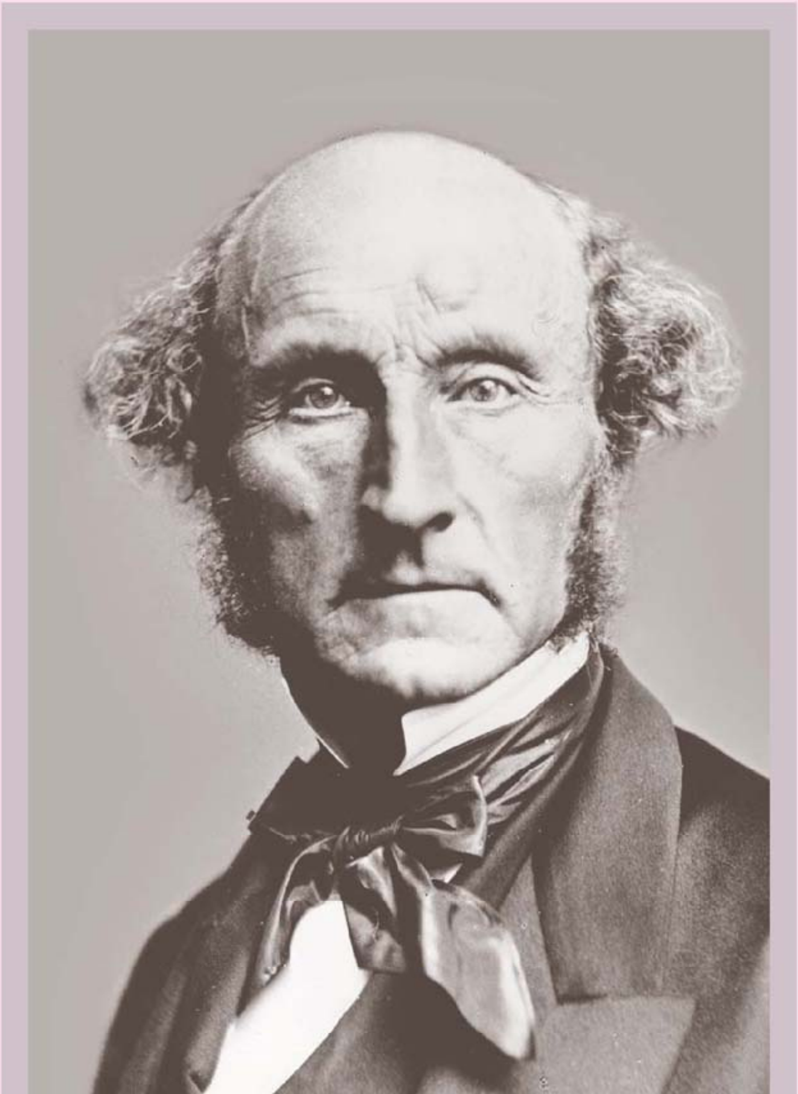

লিবারেল পার্টি থেকে ব্রিটিশ হাউস অব কমনসের সদস্য হিসেবে নারী ভোটাধিকারের সপক্ষে অভিমত প্রদান করে জন স্টুয়ার্ট মিল নারীমুক্তি আন্দোলনে অদ্যাবধি এক অক্ষয় স্থান অধিকার করে আছেন। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রণীত *The Subjection of Women*, যেখানে নারী-পুরুষের বৈষম্যবর্জিত সমঅধিকারের এক সামাজিক ধারণা প্রদান করা হয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষ রচিত এটিই সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত।

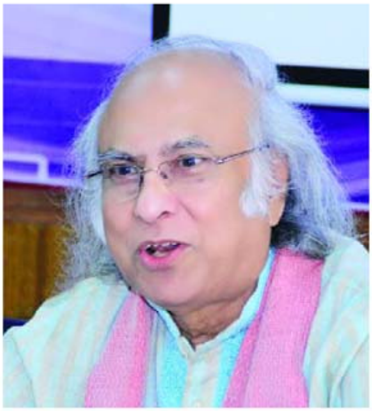

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সভাপতি
পিকেএসএফ

প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, সম্মানিত অতিথি সেলিনা হোসেনসহ অভ্যাগত অতিথি ও উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সেমিনারের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনকে এই সংস্থার সাম্বাৎসরিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে।

নির্দিষ্ট ৮ মার্চ তারিখেই আমরা এই অনুষ্ঠান আয়োজন করি না, কারণ ওই বিশেষ দিনটিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এই দিবস পালন করে থাকে। আমাদের অনুষ্ঠানে যাদের উপস্থিতি আমরা প্রত্যাশা করি, তাদের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য জায়গায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আমরা এই দিবস পালনের ওপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে থাকি। পিকেএসএফ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি যখন 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করি, তার মাধ্যমে আমি শুধু ঢাকার এই কার্যালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের বোঝাই না, পিকেএসএফ-এর দুই শতের বেশি সহযোগী সংস্থা, যারা সারা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করি। পিকেএসএফ-এ নারী দিবস উদ্‌যাপনের রীতি প্রচলিত হওয়ার পর দেখা গেছে, কিছু কিছু সহযোগী সংস্থা, স্থানীয়ভাবেও তার আয়োজন করছে এবং এর মাধ্যমে সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর উন্নয়নে নারী ও পুরুষ উভয়েরই কী করণীয়, কিভাবে নারীর মুক্তির জন্য কাজ করা যায়, যেসব বিষয়ে কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

যদিও দীর্ঘকাল ধরে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়ে আসছে, কিন্তু অদ্যাবধি মিলনায়তনের অভ্যন্তরে আয়োজিত এমন আলোচনা সভায় অথবা বাইরের সমাবেশ বা মিছিলে যে বিষয়টির ওপর সর্বত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হলো নারী-পুরুষের বৈষম্য। বহু শতাব্দী ধরে বিশ্বের নানা সমাজে পুরুষের আধিপত্য দেখা গেছে। সামাজিক রীতিনীতি এমনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, নারীর জন্য সমাজের কিছু এলাকা যেন নিষিদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাজের যারা নেতা, তারা এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মীয় অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে নারীকে পিছিয়ে রাখা হয়। আমাদের সমাজে তো একসময় মেয়েদের স্কুলে যাবার ক্ষেত্রেও বাধা প্রদান করা হয়েছে।

অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এখনকার পরিস্থিতি অনেকটা ভিন্ন। প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জেও এখন মেয়েরা মাধ্যমিক স্কুলে যাচ্ছে, কলেজে যাচ্ছে। এটা অবশ্যই উন্নতি। আর এই উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ফলে। একাত্তর সালে সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ও প্রেরণাদায়ক ভাষণে যে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম', সেই মুক্তি তো নারীরও হতে হবে। নারীরা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক। তারা পিছিয়ে থাকলে তো দেশ এগিয়ে যেতে পারবে না।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভর্তির হার কিছুটা বেশি। কিন্তু যদি বিশেষভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে পাঠ-সমাপনের বিষয়টা বিশ্লেষণ করি, তখন দেখতে পাব, এই পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েরা সংখ্যায় অনেক বেশি। দারিদ্র্যের কারণে প্রথমেই মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়া হয়। রাস্তায় বারে বারে উত্যক্ত হবার কারণেও অনেক মেয়ের স্কুলে যাওয়া ও পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে মেয়েদের বাল্যবিবাহের হার উদ্বেগজনক। আশার কথা যে, ধীরগতিতে হলেও এ বিষয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পিকেএসএফ তার জন্মের সময় থেকেই নারীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা যাদের অর্থায়ন করে থাকি, তাদের সিংহভাগ, প্রায় পঁচানব্বই ভাগই নারী। অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের বিশেষত্ব হলো, আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ বা পরিবীক্ষণ করি, যাতে যে অর্থ-সহায়তা করা হলো, তা যেন ওই নারী নিজের পছন্দ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যয় বা বিনিয়োগ করতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সে এ বিষয়ে আলোচনা করবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য আমরা তৎপর থাকি। এভাবে আমরা নারীর ক্ষমতায়নে সর্বদাই সাহায্য করি।

তাছাড়া বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অন্যদের কোনরকম বড় ধরনের সহায়তা ছাড়াই কিশোরীরাই এসব ক্লাব পরিচালনা করে, বিভিন্ন দিবস পালন করে। কিছুটা গর্বের সঙ্গেই বলতে চাই, কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অনেক জায়গায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছে। তাদের সেসব কাহিনী খবরের কাগজেও প্রকাশিত হয়েছে।

আর একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। পিকেএসএফ তার নারী কর্মীদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করে থাকে। আমাদের অফিসে কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার কথা কখনো শোনা যায়নি। তবুও আমরা নারী-কর্মীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটা সুচিন্তিত নারীনীতি প্রণয়ন করেছি। আমাদের সহযোগী সংস্থারাও এই নীতি অনুসরণে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। সহযোগী সংস্থার সদস্য ও কর্মী হিসেবে দেশের সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণ খুবই চোখে পড়ার মতো। আমাদের অফিসে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের বিষয়ে আমরা সর্বদাই সচেতন। আগামী দিনগুলিতে সমাজে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রত্যয়ে পিকেএসএফ অব্যাহতভাবে সক্রিয় থাকবে। অচিরে না হলেও নারীমুক্তি একদিন বাস্তব হয়ে উঠবে।

এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং উপস্থিত সবাইকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে পিকেএসএফ সভাপতি উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
১৮২০-১৮৯১

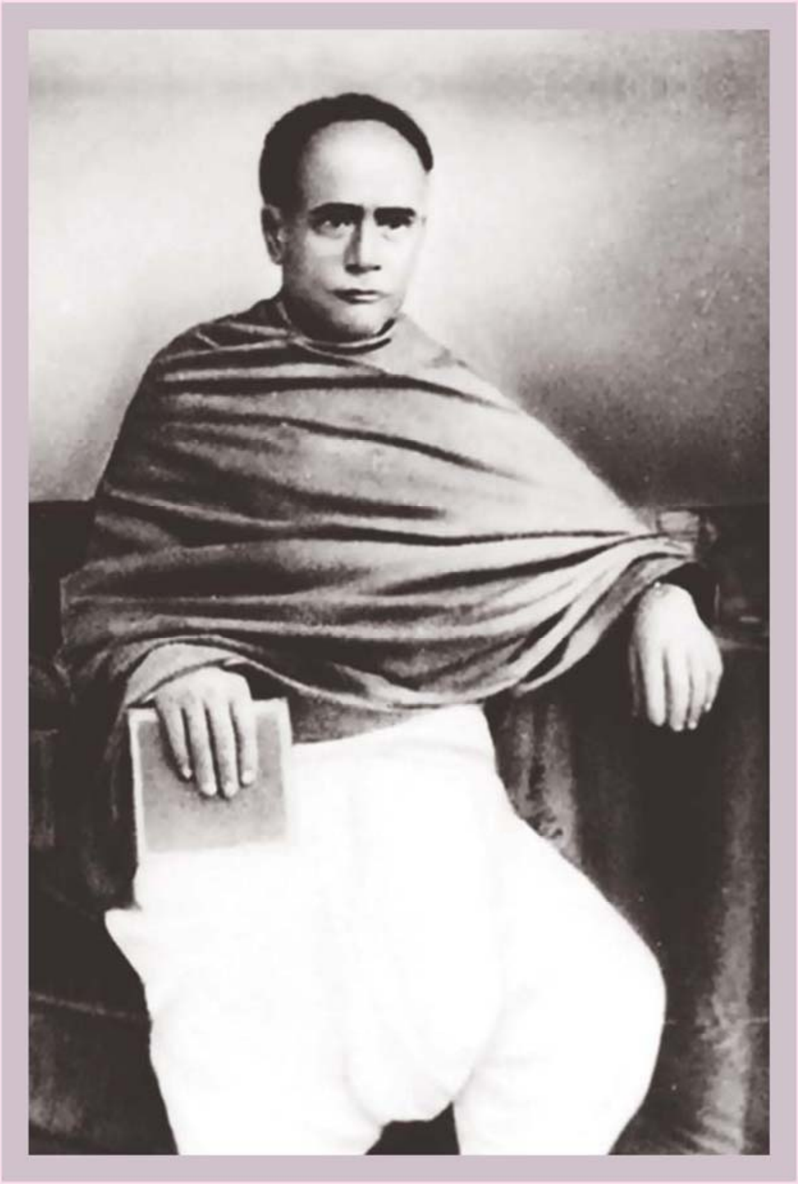

বঙ্গীয় রেনেঁসাসের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু বাংলা বর্ণপরিচয় গ্রন্থ রচনার জন্য নন, কুসংস্কার প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকার জন্য তিনি সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। নারীশিক্ষার প্রসার এবং বাঙালি হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়ার অপরাধে তিনি বহুবার শারীরিক লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। বিদ্যাসাগরের নিরবচ্ছিন্ন চাপ সৃষ্টির ফলেই ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ বিধবাবিবাহ আইন পাশ করে।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

১৮৩৪-১৯০৩

জমিদার, নারীশিক্ষার প্রবর্তক, সমাজসেবক ও কবি। মুসলমানদের কঠিন পর্দাপ্রথার মধ্যে থেকেও ফয়জুন্নেসা আরবি, ফারসি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি কুমিল্লায় একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৮৯৩ সালে পর্দানশীন, বিশেষত দরিদ্র মহিলাদের চিকিৎসার জন্য নিজ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এরূপ জনহিতৈষণার পুরস্কারস্বরূপ মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মোঃ আবদুল করিম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সেমিনারে উপস্থিত সকলকে 'বিশ্ব নারী দিবস'-এর শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা চর্চার জন্য বহু অগ্রবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশই এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে। তবে সকল সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বার্থ ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমাদের দেশে, বিশেষ করে বর্তমান সরকারের আমলে অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যদিও আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা আছে। উপমহাদেশের যেসকল নারী ব্যক্তিত্ব নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর কথা উল্লেখ করেন। এরপরে তিনি নারী শিক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম স্মরণ করেন। তিনি বেগম রোকেয়ার ***Sultana's Dream*** রচনার কথা উল্লেখ করে বলেন, বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ছিলো পুরুষরা নারীদের গৃহকর্মে সহযোগী হবে এবং নারীরা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। *অবরোধবাসিনী*, *মতিচুর* ইত্যাদি সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বেগম রোকেয়া যদি সেদিন নারী জাগরণের বাণী না শোনাতেন তাহলে হয়তো আমাদের নারী সমাজ এখনো অনেক পিছিয়ে থাকতো বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ইলা মিত্রের অবদানের কথাও স্মরণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা অনেক বাধা সত্ত্বেও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তি ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। সাম্প্রতিককালে বেগম সুফিয়া কামাল ও জাহানারা ইমামসহ আরো যারা নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি তিনি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ১৯৬১ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের আমলে জারিকৃত মুসলিম পরিবার

আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূলত সংস্কারের শুরু হয়। একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নারীদের সংসার পরিচালনা, ভরণপোষণ থেকে শুরু করে তালাক দেয়ার ক্ষমতা প্রদানের মত বেশ কিছু সংস্কার এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বলবৎ হয়। পরবর্তী সময়ে প্রণয়নকৃত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০১০-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত মুক্তিসংগ্রামে অনেক মহিয়সী নারী অবদান রেখেছেন।

সরকার ও দেশ পরিচালনার মতো কঠিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নানাবিধ বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর একান্ত চেষ্টার মাধ্যমে এই নীতিমালাসমূহকে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, এই সরকারের আমলে বেশ কিছু যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক নীতিমালা ও আইন প্রণীত হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করা গেলে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

> ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা অনেক বাধা সত্ত্বেও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তি ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। সাম্প্রতিককালে বেগম সুফিয়া কামাল ও জাহানারা ইমামসহ আরো যারা নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি তিনি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১০ ও বিধিমালা ২০১৩-তে কঠোর শাস্তির বিধান আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের আইন ও বিধিমালা এর আগে ছিল না, অনেক দেশে এখনো নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের মানবাধিকার লংঘন আইন এবং জাতীয় শিশু আইন ২০১১-এ নারীর সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধান থাকার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়াও, পিকেএসএফ'র সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের নেতৃত্বে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতেও নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার কথা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ১৯৭৯ সালের সিডো কনভেনশনে—Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)—স্বাক্ষর করা প্রথম দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেন, ১৯৮৫ সালে নাইরোবি এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত ২য়, ৩য় ও ৪র্থ নারী সম্মেলন ও ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে নারীদের ক্ষমতায়ন, শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য অনেক পদক্ষেপ গৃহীত হয় ।

বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা এবং মন্ত্রীসভায় নারী সদস্য বৃদ্ধিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংসদ নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা ক্রমেই এগিয়ে আসছেন ও ভবিষ্যতে নারীর জন্য এমন অবস্থার আরো উন্নতি হবে। তিনি বলেন, বেসামরিক সরকারি চাকরিতে বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শতকরা ২৮-২৯ ভাগ নারী চাকরি পাচ্ছেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে ৪৭তম ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ১ম অবস্থানে থাকার বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশ জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে, যেখানে আমাদের প্রতিবেশী অনেক দেশই আমাদের চেয়ে পিছিয়ে আছে।

তিনি বলেন, ২৭৭টি সহযোগী সংস্থার প্রায় ৯০০০ শাখার মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রতি বছর প্রায় ৪,০০০ কোটি টাকা বিতরণ করে এবং অর্থায়ন সেবার আওতাভুক্ত শতকরা প্রায় ৯২ ভাগই নারী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা নারীদের হাতেই টাকা দিয়ে থাকি এবং তারাই এর প্রকৃত ব্যবহারকারী কি না, সে বিষয়েও খোঁজ রাখি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। পিকেএসএফ-এর বর্তমান সভাপতির নেতৃত্বে জীবনচক্রভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ নারী-পুরুষদের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে **সমৃদ্ধি** কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী, বৃদ্ধ ও যুবকদের ক্ষমতায়ন ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এসব সত্ত্বেও বেশ কিছু সমস্যা এখনো রয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বর্তমানে বাল্যবিবাহের প্রকটতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পিকেএসএফ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে কিশোরীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে, যারা নিজেরাই ঐক্যবদ্ধভাবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ রোধে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নেয়া হচ্ছে তারপরেও অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের মেয়েদের শহরে নিয়ে গিয়ে গোপনে বিয়ে দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রেও পিকেএসএফ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, সংশ্লিষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও নারী নির্যাতন এখনো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে নারীরা সুরক্ষা পাচ্ছে না। দেখা যায়, নারীরা প্রায়ই ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। যদিও এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, প্রতিবেশী দেশসমূহসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, পিতা-মাতার ভরণপোষণ বিশেষ করে বৃদ্ধা মাকে অনেকে অবহেলা করে। এটি যাতে না করতে পারে সে জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইন পাস করেছেন, সেখানে শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন আইন থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৮৭ শতাংশ বিবাহিত নারী বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়, যার মধ্যে ৬৫ শতাংশই শারীরিক নির্যাতনের শিকার। এছাড়াও মজুরি বৈষম্য, নিরাপদ মাতৃত্বের অধিকার ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা না থাকা এবং বিশেষ করে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

নারী সহকর্মীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পিকেএসএফ জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে

ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে বলে সকলকে অবহিত করেন জনাব মোঃ আবদুল করিম। তিনি জানান, অফিস সহকারি ও দারোয়ান থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্যন্ত মাত্র ৩০০ জন কর্মচারি ও কর্মকর্তা দিয়েই আমরা ৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি ঋণস্থিতি পরিচালনা করছি। ২,০০০ কোটি টাকা ঋণস্থিতির সময়েও কর্মচারি ও কর্মকর্তা সংখ্যা প্রায় একই ছিল বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, সভাপতি মহোদয়ের উদ্যোগে নারী কর্মকর্তাদের দ্রুত পদায়নের মাধ্যমে উর্ধ্বতন পদসমূহে নিয়ে আসার পাশাপাশি পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি একজন নারীকে মহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, পিকেএসএফ যেসময় পূর্ণ বেতনে ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি চালু করে এবং সকল সহযোগী সংস্থাকে এই ছুটি অনুসরণের অনুরোধ করে, তখন সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই ছুটি চালুই হয়নি। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পিকেএসএফ যেসব কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করছে, এই সেমিনার তারই একটি প্রতিফলন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক দূর-দূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে মাননীয় প্রধান অতিথি শত ব্যস্ততার মাঝেও পিকেএসএফ-কে

সময় দেয়ায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও সমাজকল্যাণ সচিব জনাব জিল্লার রহমান ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকে পিকেএসএফ-এর আমন্ত্রণে সাড়া দেয়ার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

ক্লারা জেটকিন
১৮৫৭-১৯৩৩

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সঙ্গে ক্লারা জেটকিনের নাম চিরস্থায়ীভাবে জড়িয়ে আছে। তিনিই ৮ মার্চ তারিখকে নারী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন। কৃষক পরিবারে জন্ম নেয়া ক্লারা ছিলেন জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। জার্মানীতে নারী আন্দোলন সংগঠিত ও সম্প্রসারিত করতে তিনি আজীবন সক্রিয় ছিলেন। নারীদের ভোটাধিকার ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে গেছেন।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন

১৮৮০-১৯৩২

নারীমুক্তি আন্দোলনে প্রাতঃস্মরণীয় নাম। পরম রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করা এই নারী বিশ শতকের শুরুতে বাঙালি মুসলিম মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সাহিত্যের পাতায় আর কোন লেখকই নারীর শোচনীয় অবস্থানকে তার মত তীব্র ভাষায় উপস্থাপন করেননি। তিনি মুসলিম নারী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। বিবিসি পরিচালিত জনমত জরিপে তিনি সর্বকালের ষষ্ঠশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বিবেচিত হন।

সময় এখন নারীর : উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্মজীবন ধারা

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান নারী প্রগতির পটভূমি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে নারীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইতিবাচক পরিবর্তনের যে অসাধারণ অগ্রগতি সাম্প্রতিক সময়ে সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে শত বছরের পটভূমি। ঊনিশ শতকের বঙ্গীয় রেঁনেসা বা সামাজিক জাগরণের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালি নারীর ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি।

তিনি বলেন, বেগম রোকেয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং ইলা মিত্র এই তিন মহিয়সী নারীর জন্ম এই পূর্ব বাংলায়। বেগম রোকেয়া সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন নারী-পুরুষের সম-অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য। ইলা মিত্র স্বপ্ন দেখেছেন, শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার, যার মাধ্যমে মেহনতি মানুষের মুক্তি মিলবে। প্রীতিলতা স্বপ্ন দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে মুক্ত স্বদেশের এবং এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

তিনি উল্লেখ করেন, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এদেশের নারীদের সবচাইতে বেশি মূল্য দিতে হয়েছে–জীবন দিয়ে, সম্ভ্রম দিয়ে। তাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অন্যতম প্রাধিকার ছিল ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়

(১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থান ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিল এবং ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০০) এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

তিনি বলেন, আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যায় থেকে নারীর ক্ষমতায়ন ধারণাটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামোগত রূপ লাভ করে। নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) সনদে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে নারী অধিকার, নারীর অগ্রযাত্রা এবং লিঙ্গ সমতাভিত্তিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়ে তিনি বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ পুরুষদের সমান বা কিছু বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী ৩৩ শতাংশ।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, রাজনীতিতে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করে আঞ্চলিক নেতৃত্বে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ মর্যাদাপূর্ণ উইমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নারীর টেকসই ক্ষমতায়নে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছে। কাউকে উন্নয়নের বাইরে রেখে নয় বরং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার মূল দর্শনে সমৃদ্ধ পিকেএসএফ-এর প্রকল্পসমূহ ২৭৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১২.৭১ মিলিয়ন মানুষকে (যার মধ্যে ৯০.৯১ শতাংশ নারী) সাথে নিয়ে সব ধরনের বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছে।

পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার বৈচিত্র্যময় কর্মসূচিসমূহের মধ্যে কৃষি, অকৃষি, পশু সম্পদ উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদান, মঙ্গা মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ, অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষায়িত কার্যক্রম ও উদ্ভাবনীমূলক স্থানীয় উদ্যোগে পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখযোগ্য। এ সকল কার্যক্রমের সাফল্য দৃশ্যমান।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এক নবধারার সূচনা ঘটেছে পিকেএসএফ-এর **দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)** শীর্ষক সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে। বিভিন্ন সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী জাগরণ ও ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

তিনি বলেন, এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৫ নম্বর অভীষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে নারী ও কন্যাশিশুর সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। সীমাবদ্ধতাসমূহের উত্তরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে তার সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে, বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশে নারী-পুরুষের সমতা ও সমানাধিকার অর্জিত হবে।

ভার্জিনিয়া উলফ্

১৮৮২-১৯৪১

সাহিত্যের অঙ্গনে অন্য কারণে বিশেষভাবে স্বীকৃত হলেও, ১৯২৯ সালে প্রকাশিত *A Room of One's Own* গ্রন্থে সমাজে নারীর সমসুযোগের অভাবকে চিহ্নিত করে ভার্জিনিয়া উলফ নারীবাদী চিন্তাভাবনায় বিপুল রসদের যোগান দেন। শেকসপীয়রের এক কাল্পনিক বোনকে চিত্রায়নের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, নারীদেরও একটা যথাযোগ্য সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ থাকা উচিত।

সিমোনে দ্য বেভোয়া

১৯০৮-১৯৮৬

সারা পৃথিবীতে নারীর ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান বিষয়ে লেখালেখি করে যারা অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে সিমোনে দ্য বেভোয়া অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হন। পুরো নাম Simone Lucie Ernsetine Marie Bertrand de Beauvoir। তাঁর সর্বাধিক পাঠকনন্দিত গ্রন্থের নাম *The Second Sex*। এই গ্রন্থ সমাজে নারী নিপীড়নের যে তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছিল, তা নারীবাদী আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে।

ড. নিলুফার বানু

সভাপতি, উইমেন ফর উইমেন
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ

সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ড. নিলুফার বানু উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন। আলোচনার শুরুতে তিনি প্রবন্ধ উপস্থাপক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে সুন্দর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি উপস্থাপিত প্রবন্ধে বেশকিছু গঠনমূলক শব্দগত ও তথ্যগত পরিমার্জনের পরামর্শ প্রদান করেন। উপস্থাপিত প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার উপলব্ধি হিসেবে উল্লিখিত "মূল স্রোতধারার ধর্মীয় এবং সামাজিক শক্ত বেড়াজাল" এর পরিবর্তে "মূল স্রোতধারার ধর্মীয় এবং সামাজিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্ত বেড়াজাল"—ব্যবহার করলে অধিক গ্রহণযোগ্য হতো বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ইউনিয়ন পরিষদে দায়িত্ব নিয়ে হাজার হাজার নারী আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন উল্লেখ করা হলেও পুরুষ সহকর্মীদের নিকট থেকে তাদের যে পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে, তার উল্লেখ প্রবন্ধটিতে থাকলে প্রবন্ধটি আরো বস্তুনিষ্ঠতা পেতো বলে তিনি মনে করেন।

নারী অর্জন হিসেবে তৈরি পোশাক রপ্তানি শিল্পে ৮০ শতাংশ নারীর অবদানের কথা উল্লেখ থাকলেও, বস্তুতপক্ষে ২০১৬-তে এর পরিমাণ ছিল ৬৫ শতাংশ, বর্তমানে ৫৪ শতাংশ, যার তথ্যগত বস্তুনিষ্ঠতার ব্যাপারে প্রবন্ধ উপস্থাপকের আরো একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে তৈরি পোশাক শিল্পে নারী কর্মীর হার হ্রাস, এর কারণ ও নারী উন্নয়নে এর বিরূপ প্রভাব বিষয়ে আলোচনা থাকা উচিত ছিল বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য পুনর্বিবাহ নিরুৎসাহিত করে-এর স্থলে "অন্ধকারাচ্ছন্ন বা কুসংকারাচ্ছন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিযুক্ত হতো বলে তিনি মনে করেন।

ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাগণ যে বৈষম্যের শিকার হন তা আরো তথ্য উপাত্তসহ উপস্থাপন করা গেলে প্রবন্ধটি আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বিতরণকৃত এসএমই ঋণের মধ্যে নারী উদ্যোক্তাগণ পেয়েছেন ২.৮১% অথচ ২০১৬ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩.৭৮% এবং ২০১৪ সালে ছিল ৩.৯০%। অর্থাৎ, এটি ধীরে ধীরে বাড়ার পরিবর্তে হ্রাস পাচ্ছে। প্রবন্ধে উল্লিখিত কিছু পেশায় নিয়োজিত হওয়া থেকে নারীদের নিরুৎসাহিত করা হয় কাজের "ঐতিহ্যগত বিচ্ছেদের কারণে" এর পরিবর্তে লেখা উচিত ছিল "পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার" কারণে। নারীদের সার্বিক উন্নয়নে সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে "জেন্ডার সমতাকে বিবেচনায় নেয়া" শিরোনামের ব্যাখ্যাটি আরো পরিষ্কার করা প্রয়োজন এবং "নারী নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি" শিরোনামের অধীনে আরো আলোচনা ও উদাহরণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, এছাড়াও প্রাসঙ্গিক তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করা গেলে প্রবন্ধটি আরো ঋদ্ধ হয়ে উঠতো। যেমন: কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতকালে পরিবহনে নারীদের ওপর যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন, বেকারত্বের হারে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিবাহিত নারীর ওপর নির্যাতনের চিত্র। সার্বিক দিক থেকে নারী নির্যাতন চিত্র যেমন, ৭৯৫ জন নারী ২০১৭ সালে ধর্ষণের শিকার হয়, এর মধ্যে ৩২০ জন ধর্ষণ, ১১৭ জন গণধর্ষণের শিকার এবং ২৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় । নির্যাতিত নারীদের ওপর সংঘটিত অপরাধের বিচারিক দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় মাত্র ০৩% বিচার সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারী সাংসদদের অংশগ্রহণ ও নারী নেতৃত্বের বিকাশ, বিভিন্ন খাতে চাকুরিরত নারীদের অনুপাত যেমন: সামগ্রিকভাবে ২০১৩ সালে ৩২.৮০% নারী ছিলেন, ২০১৬ সালে তা দাঁড়িয়েছে ২৮.৫০%, যা আরো বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ ছিল বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে তিনি বলেন, আজকের আলোচনা ও উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর সুষ্ঠু প্রতিকারের ওপরই নির্ভর করছে নারীর অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতির সাফল্য এবং আমাদের গতিময় পথচলা। সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে নিজেদের এগিয়ে যেতে হবে। তিনি কবিগুরুর কয়েকটি চরণ "*যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে*" উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর আলোচনা শেষ করেন।

মুক্ত আলোচনা

সময় এখন নারীর : উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্মজীবন ধারা

ড. প্রতিমা পাল মজুমদার

সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ
পিকেএসএফ

তিনি সকলকে সুপ্রভাত এবং মহান স্বাধীনতার ৪৭ বছরে পদার্পণের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি সহযোগী সংস্থা **ইএসডিও**-র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে তাঁর প্রবন্ধে বিভিন্ন অর্জনের কথা তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ড. জামান তাঁর প্রবন্ধে মানুষকে কেন্দ্র করে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সেবাদানের যে কথা উল্লেখ করেছেন সেই প্রসঙ্গে তিনি 'ক্ষুদ্রঋণ' শব্দটির পরিবর্তে 'উপযুক্ত ঋণ' শব্দটি ব্যবহার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। তিনি নারী অগ্রগতির পথিকৃৎ হিসেবে নবাব ফয়জুন্নেসার নাম উল্লেখ করেন এবং কুমিল্লা অঞ্চলে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি ড. জামানের প্রবন্ধে নারী অগ্রগতির জন্য প্রস্তাবনাসমূহকে যথার্থ বলে উল্লেখ করেন।

২০১১ সালে গৃহীত নারী নীতির ২৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নারীর শ্রমকে দৃশ্যমান করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা জোরদারকরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। তিনি বিআইডিএস-এ থাকাকালীন কৃষিতে নারীর অবদানের ওপর গবেষণা কর্মের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আলু চাষে ৮৫% শ্রমে নারীর অবদান থাকলেও জমির মালিকানা না থাকায় তারা আলু চাষী হিসেবে স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হন। তিনি কৃষিতে নারীর ক্রমবর্ধমান ভূমিকার পেছনে বিদেশে অধিকতর পুরুষ শ্রমশক্তি রপ্তানীকে একটি নিয়ামক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন। কৃষিখাতে নারীর এই অগ্রগতিকে তিনি জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানান।

তিনি নারী দিবসের আন্তর্জাতিক শ্লোগান 'প্রগতিকে দাও গতি'র কথা উল্লেখ করেন। এই গতিদানের জন্য তিনি নারীকে শিক্ষিত করা এবং কৃষিতে নারীর উদ্ভাবনকে প্রণোদনা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। জেন্ডার বাজেটের ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবনাসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় তিনি উষ্মা প্রকাশ করেন। তাছাড়া তিনি ডেইলি স্টার পত্রিকা কর্তৃক সম্মাননাপ্রাপ্ত ১১ জন নারী উদ্যোক্তার উদাহরণ দিয়ে বলেন, তাঁরা সরকারি অনুদান ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজস্ব মেধা ও শ্রমে উদ্যোক্তা হতে পেরেছেন। এখন এসকল উদ্যোক্তার জন্য বৃহৎ ঋণ সহজলভ্য করার মাধ্যমে তাঁদের প্রগতিকে গতি দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি জানান, এসএমই ঋণ ১৫% নারীকে প্রদানের নীতি থাকলেও গবেষণায় দেখা গেছে ৩% এসএমই ঋণও নারী পায়নি। তিনি উল্লেখ করেন, যথাযথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে নারীরা নানা কাগজপত্রের জটিলতা ও বিধিবিধান ভালভাবে বুঝতে পারেন না। ঋণ কম পাওয়ার এটাও একটা বড় কারণ। তাই নারী উদ্যোক্তাদের শিক্ষার ব্যাপারে প্রণোদনা দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

নাজনীন আহমেদ

গবেষক, বিআইডিএস
সদস্য, সাধারণ পর্ষদ
পিকেএসএফ

তিনি মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট তারানা হালিমের উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি তৈরি পোশাক শিল্পে নারীকর্মী কমে যাওয়ার বিষয়ে ড. নিলুফার বানুর উদ্বেগের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, গার্মেন্টসে কাজ করতে গিয়ে নারী কর্মীদের যে পরিমাণ বোঝা বইতে হয়, তার চেয়ে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে তার সুযোগ থাকলে সেখানেই কাজ করা উচিৎ। তিনি বেগম রোকেয়ার **সুলতানার স্বপ্ন** বইটিতে পুরুষকে অন্দরমহলে পাঠানোর যে ভাবনার কথা পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্যে উল্লিখিত হয়েছে সেই প্রসঙ্গে বলেন, বর্তমান নারীরা ঘরে-বাইরে যে দ্বিগুণ চাপ সামলাচ্ছে, তাতে ঘরের কাজে পুরুষের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। তিনি এক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে প্রয়োজনে নারী বাইরের কাজ এবং পুরুষ গৃহস্থালী কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে বলে সরস ও অর্থবহ মন্তব্য করেন। তবে এই দায়িত্ব কোনরূপ আরোপিত না হয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বপ্না রেজা

সহকারী পরিচালক
মানবিক সাহায্য সংস্থা

সভার সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তিনি বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর সাথে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে পরিচিতি এবং তার সাথে একত্রে কাজ করার সুযোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত নারী নিপীড়নের নানাবিধ সংবাদের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন বর্তমান সময়ে শ্লোগান হওয়া উচিৎ 'ধর্ষণ ও উন্নয়ন পাশাপাশি যায় না, নারী নিগ্রহে উন্নয়ন হয় না'। তিনি আরো মন্তব্য করেন, স্বাধীনতা দিবসের শপথ হওয়া উচিত 'আমরা ধর্ষণমুক্ত দেশ গড়বো'। আমাদের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নারীদেরকে আমরা যে নিয়ন্ত্রণমূলক বার্তা দিচ্ছি তা একজন কিশোরও পাঠ করে এবং তা থেকেই নারী সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সে পুরুষ হিসেবে বেড়ে ওঠে। কাজেই সেই পুরুষকে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সাবরিনা শারমিন

সমন্বয়কারী
আরডিআরএস

তিনি বাংলাদেশে নারী স্বাধীনতার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে নিজের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনি নিজের কন্যাকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে যাওয়ার সময় রাস্তায় একদল চাঁদাবাজের কবলে পড়েন, যারা তাঁর কন্যাকে জিম্মি করে তাঁর কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ের একজন উচ্চশিক্ষিত, ভালো চাকরীজীবী এবং সকল দিক থেকে সক্ষম নারী হয়েও কতিপয় চাঁদাবাজের কাছে তাঁকে হেনস্তা হতে হল, যা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, কর্মজীবন ধারা বদলে যাওয়া মানেই নারীর উন্নয়ন নয়। এই স্মৃতি যে তাঁর কন্যাকে নিরন্তর মানসিকভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করবে, যা একজন নারী কিংবা একজন মানুষ হিসাবে তার সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায়। তিনি নারীদের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অবদানের কথা স্মরণ করে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা আরো জোরদার করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেন, নারীরা যতই শিক্ষায় বা কর্মক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠুক না কেন, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব যদি তাদেরকে সর্বদা ভাবিয়ে তোলে, তবে তাদের পক্ষে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

মাননীয় প্রধান অতিথির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

সাবরিনা শারমিনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সেমিনারের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব তারানা হালিম তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এ সকল অপরাধীদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পেছনে রাজনৈতিক আশ্রয়দানের অপসংস্কৃতি দায়ী। তিনি এই অপচর্চা বন্ধ করার আহ্বান জানান। একই সাথে তিনি বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে ঘুষ ও দুর্নীতির যে অপসংস্কৃতি রয়েছে তারও নিন্দা জানান এবং তা প্রতিরোধের আহ্বান জানান। কোন সন্ত্রাসীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হবে না, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের লালন হবে, তিনি এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। যে ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বক্তা এবং তাঁর কন্যাকে যেতে হয়েছে তাতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং দমে না গিয়ে সাহসের সাথে পুনরায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর দেখতে কেন যেতে হবে, সেই প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় নিপীড়িত নারীদের পাশে বঙ্গবন্ধু যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তা স্মরণ করেন। তিনি নিজে বক্তার মেয়েকে কোন পুলিশী পাহারা ব্যতিত জাদুঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বক্তার উচিত ছিল নিকটবর্তী পুলিশের কাছে অভিযোগ করে প্রতিকার চাওয়া। আমরা প্রতিবাদ করতে না শিখলে পদে পদে শুধু বাধাগ্রস্তই হব বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মোঃ বেলায়েত হোসেন

প্রকল্প ব্যবস্থাপক
হেল্প এজ ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

বক্তব্যের শুরুতেই তিনি পিকেএসএফ এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে অনেক প্রবীণ নারী উপস্থিত রয়েছেন যারা তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকার জন্য বেশ পরিচিত। কিন্তু সমাজে অনেক নিভৃতচারী নারীও রয়ে গেছেন যাদের অবদানের ফল আমরা ভোগ করছি। তিনি প্রবীণ নারী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিজের বাস্তব জীবনের একটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, একবার চক্ষু ক্যাম্প পরিচালনা করার সময় তিনি এক অশীতিপর প্রবীণ নারীর সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে তার চোখের সমস্যা বহুদিন ধরে থাকলেও তাঁর পরিবার পরিজন তাতে কর্ণপাত করেনি। তিনি উল্লেখ করেন, জনগণের মধ্যে এখনো এই বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে যে, একজন প্রবীণ নারীরও যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার আছে। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে ও গণমাধ্যমে প্রবীণ নারীর ভূমিকা রাখার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত উন্নয়নকর্মী ও নীতি-নির্ধারক এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

তিনি শ্রমের মজুরির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যের কিছু চিত্র তুলে ধরেন এবং এই বৈষম্য দূরীকরণে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি এনজিওসমূহের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি জেলা পর্যায়ের পাশাপাশি উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেন। ইসলামিক আইন অনুযায়ী নারী পরিবার হতে তার প্রাপ্য সম্পদ যাতে ঠিকমতো পায়, সে বিষয়ে আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেন। তিনি নারীবান্ধব আইন প্রণয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুকবিরোধী আইনসমূহের আরও কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের তদারকির প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।

সুলতানা রাজিয়া

নির্বাহী পরিচালক
মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র

নাজনীন সুলতানা

সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ
পিকেএসএফ

বক্তব্যের শুরুতেই তিনি জানান যে, সম্প্রতি তিনি পিকেএসএফ-এর সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং বিগত কয়েক বছর যাবৎ পিকেএসএফ যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করছে তা তাঁকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছে। তিনি পূর্ববর্তী বক্তার করুণ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেসব দুষ্কৃতিকারীরা এই কাজ করেছে তাদেরও ঘরে মা রয়েছেন এবং এ সকল মাকে সচেতন করাটা কর্তব্য যাতে তাঁদের সন্তানেরা বিপথগামী না হয়। তিনি এই সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে নারীরা উপার্জনক্ষম হলেও সেই উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত পুরুষরাই নিচ্ছেন। কাজেই কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়, এর পাশাপাশি সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মত প্রকাশের অধিকারের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নারীর প্রকৃত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচিভুক্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির প্রতি আহ্বান জানান। তিনি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে পিকেএসএফ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতার প্রামাণিক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যে বিশাল জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করছে তার সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। এ ধরনের বিস্তারিত নথিতে পিকেএসএফ নারীদের অর্থনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন এবং এই প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ কী ভূমিকা রেখেছে তার তথ্য পাওয়া যাবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন। এই বিষয়ে তিনি পিকেএসএফ-কে এমন একটি প্রকাশনা করার পরামর্শ প্রদান করেন, যেখানে পিকেএসএফ তথা সহযোগী সংস্থাসমূহের অবদানের পাশাপাশি দুর্বলতাগুলোও চিহ্নিত থাকবে এবং এর ভিত্তিতে সংস্থাসমূহ তাদের নারী-বান্ধব কর্মসূচিসমূহ আরো জোরদার করতে পারবে। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নে নারীদের অবদানের কথা স্বীকারপূর্বক নারীকে উন্নয়নে অব্যাহতভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের আহ্বান জানান।

ইকবাল আহম্মদ

নির্বাহী পরিচালক
পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
১৯১১- ১৯৩২

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রথম আত্মোৎসর্গকারী নারী প্রীতিলতাই ছিলেন সূর্যসেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী দলের প্রথম মহিলা সদস্য। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য গঠিত দলের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। আক্রমণ সফল হলেও পুরুষবেশী প্রীতিলতা পালাতে ব্যর্থ হন। তাৎক্ষণিকভাবে পটাশিয়াম সায়ানাইড গ্রহণ করে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

সুফিয়া কামাল
১৯১১-১৯৯৯

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একজন কবি হিসেবে সকলের কাছে সুপরিচিত হলেও নারীপ্রগতি আন্দোলনে তাঁর অবস্থান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোকেয়া-দর্শনে অনুপ্রাণিত সুফিয়া কামাল নারীশিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনসহ দেশের পশ্চাৎপদ মহিলাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি মুসলিম মহিলাদের মধ্যে প্রথম 'ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি 'বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

সেলিনা হোসেন

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বক্তব্যের শুরুতে বলেন, ১৯৫০ সালে ইলা মিত্র পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং 'তেভাগা' আন্দোলন সফল করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর প্রধান সহযোগী হিসেবে ছিল বাংলার আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। ১৯৫০ সালে ইলা মিত্রকে রাজশাহীর একটি রেলস্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরবর্তীকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি পুলিশ স্টেশনে প্রেরণ করা হয়। পুলিশ স্টেশনে বন্দী অবস্থায় সেখানকার পুলিশরা তাঁকে ধর্ষণ করে এবং এরপর তাঁকে জেলখানায় প্রেরণ করা হলে সেখানেও তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। যে পাকিস্তান দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছে সে রাষ্ট্রেরই পুলিশ এ জঘন্য কাজটি করেছে।

তৎকালীন ক্ষমতাসীন শাসকবৃন্দ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল 'কমিউনিস্ট পার্টি'র সাথে যোগাযোগ করে। ইলা মিত্র এই দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। একটি মুসলিম দেশে কিভাবে এরকম জঘন্য কাজ হতে পারে এ বিষয়ে একটি জবানবন্দি লিখে তা প্রকাশ করার অনুরোধ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইলা মিত্র তাঁর ধর্ষণের বিষয়ে একটি জবানবন্দি লেখেন এবং তা লিফলেট আকারে প্রকাশিত হয় যা জনমনে ব্যাপক সাড়া ফেলে। পরবর্তীকালে ইলা মিত্র সুস্থ হয়ে ১৯৫৫ সালে ভারতে চলে যান। ইলা মিত্র এদেশে থেকে কৃষকদের অধিকার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন রাজশাহীর নাচোল অঞ্চলের জমিদারের ছেলে। তা সত্ত্বেও তাঁরা সেখানে থাকতে পারেননি।

সেলিনা হোসেন উল্লেখ করেন, জীবনের সত্যকে মোকাবেলা করার যে সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রয়োজন, তা আবহমানকাল থেকেই বাংলার নারীদের মধ্যে রয়েছে। এরপরও নারীরা পিছিয়ে পড়ে শুধুমাত্র পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠা সমাজে বিবিধ বাধার কারণে। যে সমাজে পুরুষরা নারীর জায়গাটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেনি এবং তাঁদের যে কর্মস্পৃহা তা ধারণ করার মতো যথেষ্ট মনোবল ও সহযোগিতা প্রদর্শন করতে পারেনি এবং সহকর্মী

হিসেবে শ্রদ্ধার জায়গাটি প্রদর্শন করতে পারেনি। আজ ২০১৮ সালে আমরা যে নারী দিবস উদ্‌যাপন করছি, ক্লারা জেটকিন ১০০ বছরেরও বেশি পূর্বে ১৯১০ সালে জার্মানীতে এ দিবসটি পালন করার প্রস্তাব করেন।

তিনি বলেন, নারীদের পিছিয়েপড়া রোধ করার জন্য এখনও নারী দিবস পালন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নারী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য তিনি পিকেএসএফ-কে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। নারীদের পিছিয়েপড়ার সকল ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে এগুলোকে মোকাবেলা করা না হলে নারীরা আরও পিছিয়ে যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আমাদের সমাজ পরিবর্তনে, সমাজ বিনির্মাণে, মনুষ্যত্ববোধ তৈরিতে, নারী সমাজের নেতৃত্বদানকারী পথিকৃৎদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এবং তরুণ প্রজন্মকে নারীদের পিছিয়েপড়ার ক্ষেত্রগুলো জানানোর জন্য নারী দিবস উদ্‌যাপন করা জরুরি।

বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বইয়ের একটি অধ্যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনে যেতেন। সে সময় গ্রামের অনেক নারী শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অনেক বয়স্ক নারী বঙ্গবন্ধুকে খাবার দিয়ে, অর্থ দিয়ে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, একজন সত্যিকারের নেতাকে নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নারীর এই যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সেটাই সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

সেলিনা হোসেন মনে করেন, ক্ষমতায়ন যদি মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে শুধুমাত্র চেয়ার দখলকে কেন্দ্র করে হয়, তাহলে তা দিয়ে জনগণের উন্নয়ন সম্ভব নয়। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন মানবিক দর্শনকে মৌলিক জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা। ক্ষমতায়নের বিষয়ে তিনি দু'টি উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি বিশেষভাবে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের নাম স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল সময়ের মধ্যে বেগম মুজিব দু'টি অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যখন বঙ্গবন্ধুকে কুর্মিটোলা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়, সে সময় আইয়ুব খান চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে লাহোরে আলোচনায় বসাতে, যদিও এর আগে বঙ্গবন্ধু আলোচনায় বসবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। যখন এ ধরনের প্রস্তাব বঙ্গবন্ধুর কাছে দেয়া হচ্ছিল, তখন বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে একটি চিঠি বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণ করেন। ওই চিঠিতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিষেধ করেন যেন কোনক্রমেই বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তি না নেন, কারণ প্যারোলে মুক্তি নেয়া কোন সম্মানজনক কাজ হবে না। বঙ্গবন্ধু স্ত্রীর সেই উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন।

তৎকালীন অনেক আওয়ামী লীগ নেতা মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি প্যারোলে মুক্তি না নেন হয়তো তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বেগম মুজিব বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ৩৫ জন, আমি একা যদি বিধবা হতে না চাই তাহলে বাকি ৩৪ জনের কী হবে? সেলিনা হোসেন উল্লেখ করেন, তৎকালীন অনেক আওয়ামী লীগ নেতার কথায় বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী ও কন্যা বিচলিত না হয়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। এটিই আসলে 'ক্ষমতায়ন'।

এরপর সেলিনা হোসেন আরেকটি ঘটনার আলোকপাত করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন মহল থেকে বঙ্গবন্ধুকে বক্তব্যের বিষয়বস্তু সরবরাহ করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ঐ সকল বিষয়বস্তু গ্রহণ করে তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ির নীচতলা হতে দ্বিতীয় তলায় উঠেন। তখন বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুকে ঐসকল কাগজ থেকে কোন ভাষণ না দিয়ে বরং তাঁর নিজের উপলব্ধির আলোকে ভাষণ দিতে পরামর্শ দেন। এভাবেই ইতিহাসের দু'টি খুব সংকটাপন্ন মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—সেটাই ক্ষমতায়নের একটি বড় দিক।

আজকে যখন আমরা নারীদের নিয়ে কথা বলি, আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাই স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সকল নারী তাঁদের সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করে তাঁদেরকে 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তখনকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সে সকল নারীদের কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সে

সময়ে অনেক বীরাঙ্গনাকে তাঁদের পরিবার থেকে বাবার নাম প্রকাশ করতে দেয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধু ওই সকল বীরাঙ্গনার পিতার নামের জায়গায় শেখ মুজিবুর রহমান লিখতে নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধু নারীদের সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের অবদান তুলে ধরে তিনি বলেন, সম্প্রতি কাঁকন বিবি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কলা গাছের ভেলা তেরি করে দিতেন এবং বিভিন্ন সময় অস্ত্র সরবরাহ করতেন। কাঁকন বিবির সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা সিলেটের একটি নদীর ওপর নির্মিত সেতু বোমা দিয়ে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাঁকন বিবি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছিলেন।

এ পর্যায়ে সেলিনা হোসেন বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মাদার তেরেসা বাংলাদেশে এসেছিলেন। যেসব যুদ্ধশিশুদের কেউ গ্রহণ করছিলেন না, সে সকল শিশুদের মাদার তেরেসা দত্তক নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বলেন, এ সকল শিশুরা হচ্ছে মানব সন্তান। এটাই হচ্ছে একজন নারীর বিশ্বাসের জায়গা।

সেলিনা হোসেন বলেন, তিনি যৌনপল্লীর পটভূমিতে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটি রচনার জন্য তিনি রূপসা নদীর ধারে অবস্থিত একটি যৌনপল্লীতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লক্ষ করলেন, ১৮-১৯ বছরের একটি মেয়ে দুটি বাচ্চা নিয়ে বসে আছেন। তিনি কিছুটা রাগান্বিত হয়েই ওই মেয়েকে প্রশ্ন করেছিলেন কেন বাচ্চা দুটিকে নিয়ে ওই মেয়েটি এসেছে। প্রত্যুত্তরে মেয়েটি কেঁদে বলেছিল, ওই বাচ্চা দুটির বাবা তাদেরকে ফেলে চলে গেছে। বাচ্চাদের মুখে দুমুঠো ভাত দেয়ার জন্য এছাড়া তার কাছে আর কোন পথ খোলা নেই। সেলিনা হোসেন উল্লেখ করেন, তখন এখনকার মত এত পোশাক কারখানা ছিল না, যেখানে কর্মসংস্থান করা সম্ভব হত। এভাবেই একজন মা তাঁর সন্তানের মঙ্গলের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন।

পরিশেষে, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া এবং নারী-পুরুষ সমতার জায়গাটুকু তৈরি করার জন্য পুরুষদের দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, নারী বা পুরুষ এককভাবে নয়, বরং যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যেতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মোঃ জিল্লার রহমান

সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নারী জাগরণে যে সকল নারী নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের নাম স্মরণ করার পাশাপাশি বর্তমানে নারী জাগরণে/উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন উপস্থাপিত প্রবন্ধে এমন নারীদের নামও আলোচনায় আসা উচিত ছিল বলে জনাব মোঃ জিল্লার রহমান উল্লেখ করেন। পথিকৃৎ এ সকল নারীর কথা স্মরণ করে তিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, ইলা মিত্র, ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করেন।

জনাব মোঃ জিল্লার রহমান মহিলা শব্দের পরিবর্তে 'নারী' শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষে বেশ কিছু যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, নারী শব্দটির মধ্যে একটি শক্তি কাজ করে এবং অপরদিকে 'মহিলা' শব্দটি দুর্বলতা প্রকাশ করে।

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক হিসেবে একজন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি জানান, বর্তমানে সরকারিভাবে ১১,১৫,০০০ জন বয়স্ক বিধবা নারীকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে, যাতে তাঁরা স্বাবলম্বী হিসেবে জীবন নির্বাহ করতে পারেন।

নারীদের ক্ষেত্রে যখন কোন আলোচনা করা হয়, তখন প্রতিবন্ধী/বিশেষায়িত নারীদের বিষয়টি উঠে আসা জরুরি বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, এ বছর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'বালিকা এবং নারীর ক্ষমতায়ন'।

তাঁর মতে, সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে প্রথমত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষা অর্জনের ওপর বিশেষভাবে প্রাধান্য দিতে হবে। সকলের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করা হলে আমরা সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে পারব বলে তিনি মনে করেন।

মমতাজ বেগম

১৯২৩-১৯৬৭

সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্ম নেয়া কল্যাণী রায়চৌধুরী বিবাহসূত্রে হয়ে যান মমতাজ বেগম। পেশায় শিক্ষক। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে নারীদের প্রথম মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি মমতাজ বেগম গ্রেফতার বরণ করেন। তিনিই একমাত্র নারী ভাষা-সংগ্রামী যিনি দীর্ঘ সময় কারাভোগ করেছেন। কাকতালীয়ভাবে মমতাজ বেগমের কন্যার জন্মদিন ২১ ফেব্রুয়ারি।

ইলা মিত্র
১৯২৫-২০০২

প্রখ্যাত রাজনীতিক ও কমিউনিস্ট নেত্রী ছেচল্লিশের মন্বন্তরের সময় নারী-ব্যবসায়ীদের হাত থেকে অসহায় মেয়েদের রক্ষা করেন। তিনি তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের সংগঠিত করেন ও সাঁওতাল নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তারে দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন। ভারতে শিক্ষা আন্দোলন ও নারী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ইলা মিত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষেও অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

তারানা হালিম

এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে সালাম জানিয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি শুরুতেই পিকেএসএফ-কে অভিনন্দন জানান বিলম্বে হলেও নারী দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। তিনি এসডিজি অর্জন এবং উন্নত দেশের সারিতে যাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হিসাবে নারীদের বৃহৎ কর্মশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দাবি করেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশে নারীদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়ার অন্তরায় হিসেবে যে 'গ্লাস সিলিং' রয়েছে বাংলাদেশ তা ভাঙতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অবদানের কথা স্মরণ করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্ব নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে বৈষম্যের প্রতিবাদ, সমান অধিকারের দাবি উচ্চারণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতি উদ্‌যাপন করা। তিনি কয়েকজন পথিকৃৎ নারীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। যেমন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, ইলা মিত্র, মাদার তেরেসা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মালালা ইউসুফজাই, জাহানারা ইমাম প্রমুখ। তিনি এই তালিকায় আরো কিছু নাম উল্লেখ করেন। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের প্রথম ভিপি মাহফুজা খানম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষক ইতিহাস বিভাগের করুণা কণা গুপ্তা, দাবায় বাংলাদেশের প্রথম নারী আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ড মাস্টার রাণী হামিদ, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম নারী অধ্যক্ষ ড. হোসনে আরা তাহমিন, বাংলাদেশ সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র নারী সদস্য বেগম রাজিয়া বানু, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা, এভারেস্টজয়ী প্রথম বাংলাদেশী নারী নিশাত মজুমদার, বাংলাদেশের প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী উপাচার্য ফারজানা ইসলাম, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের প্রথম নারী কোষাধ্যক্ষ ইফফাত আরা মৌসুমী প্রমুখ।

এ ছাড়াও তিনি পরিচিতির আড়ালে থেকে যাওয়া অদম্য নারীদের জয়গান প্রচারণার প্রতি গুরুত্ব দেন। যেমন, সেই মেয়েটি যার স্বামী তার পরীক্ষাদানে বাধা দেয়ার জন্য আঙ্গুল কেটে দিয়েছিল, যে মেয়েটি একটা পা না থাকা সত্ত্বেও এক পায়েই লাফিয়ে লাফিয়ে ২-৩ মাইল দূরে স্কুলে যায়। তিনি বলেন, এমন অদম্য নারীরা যেন অন্তরালে থেকে না যায়। তিনি নারী অধিকার আদায়ে নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের অবদানেরও স্বীকৃতি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা স্মরণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বঙ্গবন্ধু একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নিগৃহীত নারীদের যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্বাসনে যথাযথ তৎপরতা প্রদর্শন করেছিলেন। এমনকি যেসব নারীদের পরিবার তাদের মেনে নিতে রাজি হয়নি, তিনি তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু পত্নী ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন, যিনি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে থাকা অগণিত নিভৃতচারী নারীর মতই তাঁর স্বামীর বিপদে আপদে পাশে থেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁর অনুসারীদের পরিচালনা করেছেন।

তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি নারীবান্ধব সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর কোমলতা, কঠোরতা, মানবতাবাদী, মমতাময়ী রূপের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দাত্রী, অগ্নিদগ্ধ মানুষ এবং দুঃস্থ শিল্পীদের চিকিৎসার দায়ভার গ্রহণকারিণী, পুরোনো ঢাকার স্বজনহারা তিন কন্যার অভিভাবকত্ব গ্রহণকারিণী হিসেবে তিনি মানবতাবাদী, 'মাদার অফ হিউম্যানিটি'। তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার ক্ষেত্রে যেমন কঠোর, তেমনি নিজ সন্তানদের একজন মমতাময়ী মা হিসেবে কোমলতার আধার। তিনি পরিবারের ১৭-১৮ জন সদস্যকে হারানোর পরও তাঁর পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়ী। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, নারীর এতো বহুমাত্রিক রূপের কারণেই সে অনন্য। কাজেই নারীকে অবজ্ঞার চোখে না দেখতে তিনি সবাইকে অনুরোধ করেন। তিনি নারীর যোগ্যতাকে হেয় করে দেখার যে সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি, তা পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

তিনি বর্তমান সরকারের সময়ে নারীর ক্ষমতায়নের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন, যেমন তিন বছরে নারী শ্রমিকের বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। এছাড়াও বিভিন্ন চাকুরিতে নারীদের অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। যেমন, সেনাবাহিনীতে ৭০০ জন নারী কর্মকর্তা, বিমানবাহিনীতে ১৬২ জন কর্মকর্তা, নৌবাহিনীতে ৯২ জন কর্মকর্তা, পুলিশে বিভিন্ন পদে ১১,০৩৮ জন, সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন পদে ২,৭৯৮

জন, স্কুল পর্যায়ে সরকারি নারী শিক্ষক ৩১.৫০%, কলেজ পর্যায়ে সরকারি নারী শিক্ষক ২৬.৭২%। এছাড়াও জনপ্রশাসনে গত তিন বছরে বিভিন্ন ক্যাডারে মোট ১২,১৩০ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪,৫৬৯ জন নারী।

তিনি আরো জানান যে, বর্তমান সরকারের সময়ে ৪০টি মন্ত্রণালয় থেকে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন প্রণীত হয়েছে, তাৎক্ষণিক সহযোগিতার জন একটি নাম্বার (৯৯৯) রয়েছে। নারীদের জন্যে বিশেষ হেল্পলাইন ১০৯২১ রয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে সিংহভাগ স্বাস্থ্যসেবাগ্রহীতা নারী। দেশে মানব পাচার প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর মত আইন বিদ্যমান রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো উল্লেখ করেন, সাতটি বিভাগে ৮০টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ২০টি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। এছাড়া তিনি নারীদের আইনগত সহায়তা ব্যবস্থা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতার মত সুযোগ সুবিধা প্রদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তিনটি বাধা অর্থাৎ তিনটি M—মানি, মাস্‌ল এবং ম্যান-এর কথা উল্লেখ করেন। মানি সমস্যা বলতে তিনি নারীদের নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয় করার অর্থের অপ্রতুলতার কথা, মাস্‌ল সমস্যা বলতে নারীদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসী লালনের অক্ষমতার কথা এবং ম্যান সমস্যা বলতে এলাকার পুরুষদের নারীর রাজনীতি করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার মানসিকতার অভাবকে তুলে ধরেন। তিনি এসকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চুপ না থেকে উন্মুক্ত আলোচনার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহের কথা সকলকে অবহিত করেন। তিনি জানান, বর্তমান সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ১২,০০০ নারী নির্বাচিত হয়েছেন। তাছাড়া নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্রমবর্ধমান চিত্র উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নারী প্রার্থী ছিলেন ১০২, ২০০৩ এ ২৩২ এবং ২০১১ তে ২২৬ জন। তিনি গর্বের সাথে বলেন, বিশ্বের শীর্ষ দশ অনুপ্রেরণাদানকারী নারী নেতৃত্বের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান দ্বিতীয়।

তিনি বলেন, নারী আত্মশক্তিতে বলীয়ান হলেই নারীমুক্তি সম্ভব। তিনি জাতীয় রাজস্ব আয়ের একটি অংশ প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে ব্যয় করার প্রস্তাব করেন। নিজের ইচ্ছানুযায়ী গৃহস্থালী বা অফিস-আদালতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীদের অধিকারকে সম্মান জানানোর জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান। জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী কণ্ঠস্বরকে জোরালো করা সম্ভব বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি

বর্তমান সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ১২,০০০ নারী নির্বাচিত হয়েছেন। তাছাড়া নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্রমবর্ধমান চিত্র উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নারী প্রার্থী ছিলেন ১০২, ২০০৩ সালে ২৩২ এবং ২০১১ সালে ২২৬ জন। তিনি গর্বের সাথে বলেন, বিশ্বের শীর্ষ দশ অনুপ্রেরণাদানকারী নারী নেতৃত্বের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান দ্বিতীয়।

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও নারীবান্ধব হওয়ার প্রতি জোর দেন। নারীদের একে অপরের ক্ষতি করার যে মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় তা পরিহার করা সম্ভব হলেই নারীর ক্ষমতায়ন অনেকাংশে নিশ্চিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাহানারা ইমাম
১৯২৯-১৯৯৪

শহীদজননী খ্যাত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়করূপে দেশজোড়া পরিচিত জাহানারা ইমাম মুসলিম পরিবারের রক্ষণশীলতার বাইরে এসে আধুনিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ *একাত্তরের দিনগুলি*। মুক্তিযুদ্ধের সময় মা হিসেবে তিনি রুমীকে যুদ্ধে অংশ নিতে নিজ হাতে পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতনের অপরাধের বিচারের দাবিতে তিনি সোচ্চার ছিলেন।

শিরিন এবাদি
১৯৪৭-

২০০৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত ইরানের শিরিন এবাদি হলেন প্রথম মুসলিম নারী যিনি এই অর্জনের মাধ্যমে বিশেষত মুসলিম দুনিয়ায় নারীর অধস্তন অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহবান ছড়িয়ে দেন। আইনজীবী ও সাবেক বিচারক শিরিন এবাদি ইরানের Defenders of Human Rights-এর প্রতিষ্ঠাতা। নারী ও শিশু অধিকারের বিষয়ে সর্বদাই উচ্চকণ্ঠ এই তেজস্বী নারী বর্তমানে যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্য

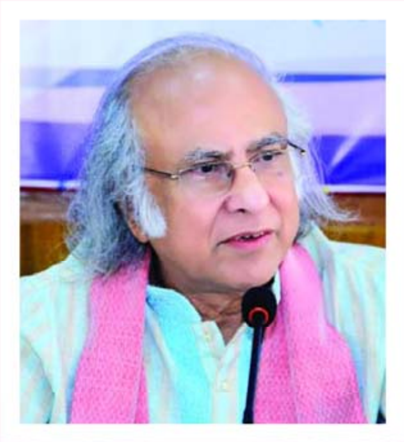

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

সভাপতি
পিকেএসএফ

সিডো কনভেনশনে বাংলাদেশের স্বাক্ষর করা বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, সিডো কনভেনশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ২টি ধারা আমরা এখনো গ্রহণ করিনি এবং গ্রহণ করা হবে না মর্মে সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে। তিনি বলেন, কিছু ক্ষেত্রে আমাদের যেমন অগ্রগতি আছে আবার কিছুক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি। এ সময় তিনি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন, স্নাতোকোত্তরে তাঁর নারী সহপাঠী ছিলেন মাত্র ৩ জন। তাঁরা শিক্ষকদের সাথে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতেন ও শিক্ষকদের সাথেই বেরিয়ে যেতেন সেই রীতি এখন আর নেই। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়, যা সার্বিক অগ্রগতির নির্দেশক।

তিনি বলেন, অনেক সমস্যা আছে যেগুলো সমাধানে পিকেএসএফ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, পর্ষদের নির্দেশে নারী মহাব্যবস্থাপক নিয়োগের বিষয়ে দুইবার বিজ্ঞাপন দিতে হলেও শেষ পর্যন্ত সেই নিয়োগ সম্পন্ন করা গেছে। এছাড়াও পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদে আগে ৪ জন পুরুষ ও ২ জন নারী থাকলেও এখন ৩ জন করে নারী ও পুরুষ রয়েছে, অর্থাৎ সমতা এসেছে। সাধারণ পর্ষদেও অনেক নারী সদস্য রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সভাপতি বলেন, অত্যন্ত কঠিন কাজ হওয়া সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনা ও অফিস পরিচালনা উভয় পর্যায়েই নারী ও পুরুষের সংখ্যায় সমতা আনার চেষ্টা করছে পিকেএসএফ।

তিনি বলেন, ৫ বছর আগে পিকেএসএফ-এ প্রথম নারী দিবস পালনের প্রস্তাব করার সময় অনেকেই সংশয়ে ছিলেন। বর্তমানে পিকেএসএফ ক্ষুদ্রঋণের ধারণা থেকে সরে এসেছে এবং নিয়মিতভাবে মানবকেন্দ্রিক নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছে, যার মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর ফলে বিষয়টি এখন সকল কর্মকর্তার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা সবসময় এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, এ ধরনের বিষয় একবার শুরু করলে সেটা ক্রমশ এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় তিনি উল্লেখ করেন, পিকেএসএফ-এ নারী দিবসের প্রথম আয়োজনে উপস্থিত সবাই ছিল নারী, এবং এটা আসলে একটা ভুল ধারণা যে নারী নিয়ে কোন আয়োজন হলে শুধু নারীরাই হবে অংশগ্রহণকারী। সেজন্যে পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতে অর্ধেক অংশগ্রহণকারী পুরুষ হতে হবে বলে নির্দেশনা দেয়া হয়।

তিনি বলেন, যাদের স্মরণ করা উচিত তাদের অনেককেই আমরা স্মরণ করি না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর নারী আন্দোলন প্রথম যখন শুরু হয় তখন জাহানারা হক, সালমা খান, খালেদা সালাউদ্দিন ও অর্থনীতিবিদ আখতারি খানম এবং আরো অনেকে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তারা সে সময়ে শুরু করলেও তাদের কোন অফিস ছিল না। তাই তিনি বিআইডিএস-এ তাদের কাজ করার জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন, একমাত্র পুরুষ সদস্য হিসেবে তিনি প্রায়ই তাদের সাথে বসতেন, তাদের কথা শুনতেন। অর্থনীতি সমিতিতে সাধারণ সম্পাদক থাকার সময়েও সংগঠনের সম্মেলনে নারীদের জন্য আলাদা সময় দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে তিনি জানান। এইসব নারীদের তিনি বলেন, আমরা অনেক সময়ই ইতিহাস ভুলে যাই আর শুধু মৃতদেরকে স্মরণ করি, কিন্তু জীবিতদের কথা বলি না। এসময়ে তিনি পিকেএসএফ থেকে জাহানারা হককে স্বীকৃতি প্রদানের কথাও উল্লেখ করেন।

সভাপতি মহোদয় অবহিত করেন, পিকেএসএফ ২০১৭-১৮ সালে প্রারম্ভিকভাবে ২০টি ইউনিয়নে নারী দিবস উদ্‌যাপন করেছে। ভবিষ্যতে এর ব্যাপ্তি আরো সম্প্রসারণ করা হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, যারা শুধু ঋণ দান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাদেরকে পিকেএসএফ সহযোগী প্রতিষ্ঠান বলে এবং এর পাশাপাশি যারা শুধু সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং বিশেষ কোন উদ্ভাবনী কাজ করে সেসব প্রতিষ্ঠানকে পিকেএসএফ অংশী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করে। ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এর এমনই একটি অংশী প্রতিষ্ঠান, যারা মা ও শিশু এবং স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা নিয়ে কাজ করছে। এ ধরনের কাজ নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে এবং সেটা পিকেএসএফ তার অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এই অগ্রগতিকে সুসংহত ও ত্বরান্বিত করতে হবে, এখানে কী কী ঘাটতি আছে—সেগুলো দূর করে আমরা নারী-পুরুষ সবাই মিলে এগিয়ে যাব। তিনি বলেন, যেখানে নারীরা পিছিয়ে আছে, তাদেরকে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে হবে, যাতে তারা সমপর্যায়ে আসে, কারণ সবাই মানুষ। তিনি বলেন, এই জিনিসটা আমাদের সবার মনে রাখতে হবে যে, নারী-পুরুষ ধনী-গরীব সবাই মানুষ, সবার অধিকার সমান, সবার মর্যাদা সমান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর **সমৃদ্ধি** কার্যক্রমের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন,

> পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন কর্মএলাকায় ১৬ ঘণ্টার ডিজিটাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় এক লাখ তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন মানবিক গুণাবলীর ওপরে প্রশিক্ষিত করেছে। এসব প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে অর্ধেক পুরুষ আর অর্ধেক নারী। তারা নিজেদের এলাকায় বাল্যবিবাহ ও নারী উত্যক্তকারীদের প্রতিরোধ করছে। তারা মাদকাসক্তি, তামাক সেবন ইত্যাদির বিরুদ্ধেও আন্দোলন করছে এবং পিকেএসএফ তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে।

সবার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই কাজটিই আমরা **সমৃদ্ধি**-তে করার চেষ্টা করছি। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির প্রথম কথাটাই হচ্ছে, সবাই মানুষ এবং প্রত্যেকের অধিকার সমান। **সমৃদ্ধি**-তে সাম্যের কথা আছে, মানবাধিকারের কথা আছে, মানব মর্যাদার কথা আছে যেটা আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আছে, রূপকল্প ২০২১-এ আছে। কাজেই আমরা স্বাধীনতার ঘোষণা ও রূপকল্প ২০২১-কে ধারণ করে **সমৃদ্ধি**-কে সাজিয়েছি এবং বর্তমানে এর সাথে টেকসই উন্নয়ন যুক্ত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, **সমৃদ্ধি**-তে আমরা নারী পুরুষ সবাইকে সমানভাবে দেখছি এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচিভুক্ত ২০০টি ইউনিয়নে নারীর অগ্রগতি নিশ্চিতকরণে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি।

সভাপতি মহোদয় বলেন, পিকেএসএফ নারী ও পিছিয়েপড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করে, যাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো নারী কৃষিশ্রমিক, যাদেরকে সবাই ভুলে যায়। তিনি বলেন, কৃষি বললেই সবাই কৃষককে বোঝায়, কৃষিশ্রমিকের কথা তেমন আসে না। তাই পিকেএসএফ নারী কৃষিশ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে। এছাড়াও পিকেএসএফ হিজড়া, বেদে মেয়ে, পাহাড়ি ও হাওরের নারী–শিশুদের নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পিকেএসএফ বাস্তবতার আলোকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব সমস্যা আছে সেগুলো বিবেচনা করে বিশেষ কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। এমনিভাবে, পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন কর্মএলাকায় ১৬ ঘণ্টার ডিজিটাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় এক লাখ তরুণ-তরুণীকে বিভিন্ন মানবিক গুণাবলীর ওপরে প্রশিক্ষিত করেছে। এসব প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে অর্ধেক পুরুষ আর অর্ধেক নারী। তারা নিজেদের এলাকায় বাল্যবিবাহ ও নারী উত্যক্তকারীদের প্রতিরোধ করছে। তারা মাদকাসক্তি, তামাক সেবন ইত্যাদির বিরুদ্ধেও আন্দোলন করছে এবং পিকেএসএফ তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে।

সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, যেহেতু আমরা প্রধানত গ্রামাঞ্চল নিয়ে কাজ করি, তাই আমরা চেষ্টা করছি গ্রামীণ সমাজে যেসব ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করার। তিনি বলেন, যেহেতু পিকেএসএফ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান সেহেতু সরকারের নীতি কাঠামোর আঙ্গিকের মধ্যে থেকেই আমরা এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও কার্যকর করার চেষ্টা করি। অনেক ক্ষেত্রেই নীতি, আইন ও কর্মসূচি থাকার পরেও বাস্তবে যাদের কাছে উপকার পৌঁছানোর কথা তাদের কাছে না পৌঁছানোর বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা পিকেএসএফ যার কাছে যেটা পৌঁছা

দরকার সেটা নিশ্চিতভাবে পৌঁছে দেই, এখানে কোথাও কোন ব্যতিক্রম হয় না।

পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীদের উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে তাদের আয় বাড়বে, দারিদ্র্য কমবে, জাতীয় আয়ে তাদের অবদান বৃদ্ধি পাবে এবং বৈষম্যও কমবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সরকারের নীতিতেও পিছিয়েপড়া ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত করার কথা বলা আছে। তিনি বলেন, বয়স্কদের জন্য ভাতার প্রয়োজন থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি বিবেচনায় তাদেরকে ভবিষ্যতে কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। তাই পিকেএসএফ বয়স্ক নারী-পুরুষদের মাঝে কাজ করছে। তাছাড়া, তরুণ ও কিশোর-কিশোরীদের নিয়েও পিকেএসএফ-এর কাজ আছে। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সমাজ যাতে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হতে পারে, সে কাজগুলো করতে। আমরা প্রতিটা আলোচনা সভা থেকে শিখি, সেখান থেকে যেগুলো বেরিয়ে আসে, যেটা বাস্তবায়নযোগ্য এবং পিকেএসএফ-এর সামর্থ্যের মধ্যে আছে, সেগুলি আমরা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি। আগেও একইভাবে কাজ করেছি, কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আজকের সেমিনার থেকেও যেসব সুপারিশ বেরিয়ে আসবে আমরা সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।

যে যেটা করতে চায় তাকে সেটা করার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া উচিত বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সুযোগগুলো থাকলে তারপরে আসবে আমি কী করব আর কী করব না। উদাহরণস্বরূপ রান্না করা ছাড়া আর কোন সুযোগ না থাকলে মানুষ রান্না করতেই বাধ্য হবে উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, সেজন্য আমি সবসময় বলা ও লেখার চেষ্টা করেছি যে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই সমসুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার পরে যে যেটা সিদ্ধান্ত নিতে চায়, যে যেটা করতে চায় সেটা তাকে করতে দিতে হবে এবং তাকে সহায়তা করতে হবে। উদাহারণস্বরূপ তিনি বলেন, একটা বিদ্যালয় করে দেয়া হলো, কিন্তু সেখানে বাচ্চা আসছে না কারণ, সে দরিদ্র, তার পরিধানযোগ্য কাপড় নেই। সেজন্যই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার পরেও মানুষ যেন তা গ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আর তাহলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলছি তা সম্ভব হবে। যেখানে সবার সমসুযোগ থাকবে, সবার মানবাধিকার ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়ে তাঁর নেতৃত্বে শুধু নারীর ক্ষেত্রে নয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে সেটা আমাদের সবাইকে স্মরণ রাখার বিষয়ে জোর দিয়ে তিনি বলেন, আমি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে জানি। তিনি অনেক চিন্তা করেন এবং সেই চিন্তার ফসল হিসেবে তিনি যে নীতি গ্রহণ করেন সেটা বাস্তবায়ন করারও চেষ্টা করেন।

আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সমাজ যাতে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হতে পারে, সে কাজগুলো করতে। আমরা প্রতিটা আলোচনা সভা থেকে শিখি, সেখান থেকে যেগুলো বেরিয়ে আসে, যেটা বাস্তবায়নযোগ্য এবং পিকেএসএফ-এর সামর্থ্যের মধ্যে আছে, সেগুলি আমরা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি। আগেও একইভাবে কাজ করেছি, কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আজকের সেমিনার থেকেও যেসব সুপারিশ বেরিয়ে আসবে আমরা সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।

সভাপতি মহোদয় সেমিনারের প্রধান অতিথি, বিশেষ ও সম্মানিত অতিথি, প্রবন্ধ উপস্থাপক, মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্যের পরিসমাপ্তি টানেন।

শেখ হাসিনা
১৯৪৭-

ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে সক্রিয় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী শিক্ষা, নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি, নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রণীত নারীনীতি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক ঐতিহাসিক সনদ। যার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮'।

পরিশিষ্ট

সময় এখন নারীর : উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্মজীবন ধারা

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

ভূমিকা

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন, সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারার যে অসাধারণ অগ্রগতি সাম্প্রতিক সময়ে সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে তার পেছনে শত বছরের ঐতিহ্যগত পটভূমি রয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই অতীত পটভূমির বিস্তৃত ক্যানভাসের সঙ্গে বর্তমানের উন্নয়নের ধারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ঊনিশ শতকের বঙ্গীয় রেঁনেসা বা সামাজিক জাগরণের মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালি নারীর ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি। বিশেষত, রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের সামাজিক উদ্যোগসমূহ এক্ষেত্রে মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত। নারীর মর্যাদা ও গৃহস্থালী কর্মের বাইরে নারীর অংশগ্রহণে নব প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক প্রভাব বাঙালি মুসলিম সমাজে মৃদু তরঙ্গ সৃষ্টি করে, যার ধারাবাহিকতায় উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মুসলিম নারীরা দাতব্য কার্যক্রমে যুক্ত হতে থাকেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাঙালি মুসলিম নারীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) মূল ভিত্তি স্থাপন করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নারী উন্নয়নে বিবিধ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং প্রাসঙ্গিক রচনার মাধ্যমে তিনি নিস্তরঙ্গ বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে ক্ষমতায়নের মূল বীজ প্রোথিত করেছেন। বেগম রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন মূল স্রোতধারার ধর্মীয় এবং সামাজিক শক্ত বেড়াজালকে সরাসরি প্রতিপক্ষ বানালে নারীর ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। যে কারণে তিনি নারী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে নারীর ক্ষমতায়নের সামাজিক আন্দোলনকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের ভূমিতে তিনজন মহিয়সী নারীর জন্ম জাতিগতভাবে আমাদেরকে এভারেষ্ট শৃঙ্গের চাইতেও উঁচু মর্যাদায় আসীন করেছে। বেগম রোকেয়া, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং ইলা মিত্র—এই তিন মহিয়সী নারীর জন্ম এই পূর্ব বাংলায়। রংপুরের পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়া, চট্টগ্রামে প্রীতিলতা, ঝিনাইদহে ইলা মিত্র। তিনজনের সামাজিক অবস্থান ছিল ভিন্ন। বেগম রোকেয়া ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম জমিদার পরিবারের সন্তান, প্রীতিলতা নিম্ন মধ্যবিত্ত করণিক পরিবারের সন্তান এবং ইলা মিত্র উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সন্তান। শিক্ষা-দীক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতেও পার্থক্য ছিল। বেগম রোকেয়া বয়সের দিক থেকে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে, প্রীতিলতার ১৯১১ সালে এবং ইলা মিত্রের ১৯২৫ সালে। বেগম রোকেয়া ও প্রীতিলতা দুজনেই ধরাধাম ত্যাগ করেছেন ১৯৩২ সালে এবং ইলা মিত্র ২০০২ সালে। বেগম রোকেয়া সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন নারী-পুরুষের সম-অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য। নারী শিক্ষা এবং নারীর কর্ম ব্যতিরেকে সমাজে নারীর অবস্থানগত উন্নয়ন যে একেবারেই সম্ভব নয়, এটি তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, সারা জীবন লড়াই করেছেন এবং নারী অধিকার যে

মানবাধিকার তা প্রমাণ করেছেন। ইলা মিত্র শোষণহীন সমাজব্যবস্থা এবং শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে মেহনতি মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তার ফল হিসেবে অমানবিক নির্যাতন সয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে নানা জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করেছেন মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য। প্রীতিলতা স্বপ্ন দেখেছেন সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে মুক্ত স্বদেশের এবং সেই সংগ্রামে এক বুক স্বপ্ন নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। বেগম রোকেয়া, প্রীতিলতা এবং ইলা মিত্র তিনজনই বাঙালি সমাজের অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে আছেন, থাকবেন অনাগত ভবিষ্যতে। তিনজনই তৃণমূল মানুষের মুক্তির জন্য স্বপ্ন দেখেছেন এবং স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত হননি, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন ।

১৯৪৭ সালের বেদনাদায়ক দেশভাগ এবং অলীক রাষ্ট্র পাকিস্তানী শাসনামলে নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী আন্দোলনের অনেক উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও নারীদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তবে এক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বাঙালি মুসলিম নারীদের ক্ষমতায়নে All Pakistan Women's Association (APWA)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। APWA-এর উদ্যোগে ৫৫,০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ Muslim Family Law Ordinance (MFLO) ১৯৬১ সালে পাশ হয় এবং কোন সন্দেহ নেই বাংলাদেশের তৃণমূল থেকে নগর পর্যন্ত সকল মুসলিম নারীর ক্ষেত্রে সবচাইতে কার্যকর ক্ষমতায়নের ভিত্তি হিসেবে আজও তা মুসলিম পারিবারিক আইন স্বীকৃত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেগম সুফিয়া কামাল এবং মহিলা পরিষদের নেতৃত্বে প্রগতিশীল নারী আন্দোলন নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এক নদী রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে লাল সবুজের যে অসম্ভব সুন্দর ব-দ্বীপটি স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেই মুক্তিসংগ্রামে এদেশের নারীদের জীবন দিয়ে, সম্ভ্রম দিয়ে সবচাইতে অধিক মূল্য দিতে হয়েছে। বিশেষভবে, মধ্যযুগীয় বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দালাল রাজাকার আলবদর আলশামস বাহিনীর নারকীয় ভয়াবহ যজ্ঞের শিকার হতে হয়েছে তাঁদের। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তাই অন্যতম প্রাধিকার ছিল ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি গৃহীত হয়। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য প্রথমবারের মত নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায় ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭২ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাদের বীরাঙ্গনা হিসেবে অভিহিত করেন। যে সব মায়েদের পাক-বাহিনীর অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল, তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষত শহীদের স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য চাকরি ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার।

বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল, (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, (খ) যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, (গ) পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের মেয়ের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সনে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুনর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (গ্রামীণ মহিলা ক্লাব) চালু করে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়

গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীকালে এই উদ্যোগ বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী সমবায় কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সনে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচির কাজও শুরু হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন, নারীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কাঠামোগত ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারী সংগঠনসমূহের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহও ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। কাঠামোগতভাবে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে পরিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০০) এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণিধানযোগ্য। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, গৃহ নির্যাতন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, মানবাধিকার লঙ্ঘন (পিএসএইচটি) আইন ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ এবং জাতীয় শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। যৌন নিপীড়ন ও ফতোয়া নিয়ে হাইকোর্টের পক্ষ থেকে কার্যকর রায় দেয়া হয়েছে এবং নারীর নিরাপত্তা ও উপকারিতায় বিদেশী কর্মসংস্থান এবং অভিবাসন আইন ২০১৩ এবং পর্ণোগ্রাফি কন্ট্রোল অ্যাক্ট ২০১২ প্রণীত হয়েছে। কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেগুলোর লিঙ্গভিত্তিক বিবেচনা অন্যগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেমন, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে নারী উন্নয়ন

১৯৫০'র দশকে 'চুঁইয়ে পড়া নীতির' তাত্ত্বিক উন্নয়ন ধারায় নারী উন্নয়ন বিষয়টি তেমনভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং দারিদ্র্য হ্রাস করার কৌশলে পুরুষদেরকেই কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনায় রেখে নারীদের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিশু সুরক্ষার বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়।

৬০'র দশক থেকে পুরুষতান্ত্রিক উন্নয়নের ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার উন্নয়ন তত্ত্বে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অভিগম্যতা না থাকায় তাঁদের বিপদাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করে আয় ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

মূলত ৮০'র দশক থেকে নারী-পুরুষের সমঅধিকার, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের অংশীদারিত্বের ধারণা বিকশিত হতে থাকে। ৮০'র দশকের মাঝামাঝি পর্যায় থেকে নারীর ক্ষমতায়ন ধারণাটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামোগত রূপ লাভ করে। নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত 'সিডো' সনদে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে নারী অধিকার, নারীর অগ্রযাত্রা এবং লিঙ্গ সমতাভিত্তিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে।

এ সকল ধারাবাহিক নারী উন্নয়নের অভিযাত্রার পেছনে আন্তর্জাতিকভাবে অনেকগুলো পদক্ষেপ কাজ করেছে। যার মধ্যে Women in Development, Women and Development, Gender and Development Approach, Moser's Gender Planning Framework (কল্যাণ, সমতা, দারিদ্র্য নির্মূল, দক্ষতা ও ক্ষমতায়ন) যেমন পদ্ধতিগতভাবে নারী অধিকারকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনি ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন, ১৯৭৫-১৯৮৫ দশককে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এবং সমতা উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিপাদ্যকে বিবেচনায় রেখে নারী দশক ঘোষণা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

একই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৯ সালে Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) অনুমোদন এবং ১৯৮১ সাল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে তা কার্যকর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন, ৮০'র দশকের শুরুতে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রমুখী কৌশল নির্ধারণ, ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায়

অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয়, ক্ষমতা বণ্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়। ১৯৯৫ সালে কমনওয়েলথ জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সার্ক দেশসমূহও নারী উন্নয়নের জন্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবার অসম সুযোগ, নারী নির্যাতন, সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে নারীর ঝুঁকিগ্রস্ততা, অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা, নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার এবং কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য। এই সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৯২ সালে রিও-ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন ও তাদের অধিকারের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নারী উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবর্তিত গ্রাম-শহরের জীবনধারা

বাংলাদেশে নারীর ক্রমউন্নয়ন ধারা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু জরিপ (Bangladesh Maternal Mortaliy Survey-BMSS) অনুযায়ী মাতৃমৃত্যুর হার ৩২২ থেকে ১৭৬-এ নেমে এসেছে। গত নয় বছরে এই হার ৪০ শতাংশ কমে এসেছে। গ্লোবাল জেন্ডার ইনডেক্স অনুযায়ী ২০১৪ সালের শিক্ষার অর্জন ও স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবনধারা–সকল ক্ষেত্রেই লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। সামাজিক অগ্রগতি সূচক অনুযায়ী ২০১৪ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫২০৪ যা পাকিস্তান, ভারত এবং নেপালের তুলনায় বেশি। এমডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। স্বাধীনতার চার দশকে অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্জন একটি বৈশ্বিক দৃষ্টান্ত। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রণীত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী (২০১৫), নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাসে বাংলাদেশ ৭৫তম স্থান থেকে ৬৮তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক রূপান্তরে নারীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উজ্জ্বলতম উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে নারীর বিশিষ্ট অবদানের ফলে। উল্লেখ্য, নারী শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসম্মত পারিবারিক স্যানিটেশন, নারীর প্রজনন হার ও শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস, উদরাময় নির্মূল ও পুরুষের তুলনায় নারীর গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ইত্যাদিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন নারীরাই, যা পরোক্ষভাবে কর্মক্ষম জনশক্তি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ পুরুষদের সমান বা কিছু বেশি। সরকারি চাকুরিজীবীদের মধ্যে নারী ২৪ শতাংশ। আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী ৩৩ শতাংশ। বিসিএস-এর মাধ্যমে নারীর চাকরি পাওয়ার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। অর্থনৈতিক শুমারি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানপ্রধান হিসেবে নারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ শুমারির সময় ২০১৩ সালে দেশে মোট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মহিলাপ্রধান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৬৩ হাজার ৩৬৮, যা মোট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৭ দশমিক ২১ শতাংশ। ২০০১ এবং ২০০৩ সালে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখ ৩ হাজার ৮৫৮, যা মোট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২ দশমিক ৮০ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, এক দশকে

প্রতিষ্ঠানপ্রধান হিসেবে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচ গুণেরও বেশি।

ইতোমধ্যেই নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষিক্ষেত্রে বহুমুখী উদ্যোগ, দুর্যোগ মোকাবেলা, শহর ও গ্রামের মধ্যে সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন এই পাঁচটি ক্ষেত্রে নিজস্ব কায়দায় বাংলাদেশ ব্যাপক উন্নতি করেছে। এই অর্জনের পেছনে নারীর অবদান সবচাইতে বেশি।

বাংলাদেশের নারীরা আজ প্রতি ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখছেন। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিরক্ষায় নেতৃত্ব প্রদান এবং দেশের অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে তারা তাদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদে হাজার হাজার নারী অংশ নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন।

সার্বিক মূল্যায়নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নারীর বিরাট অবদান রয়েছে। চরম দারিদ্র্য হ্রাস ও ক্ষুধা নির্মূলের একটি মূল কারণ উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন। দেশের খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তিগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকের সিংহভাগ ভূমিকা রয়েছে। খাদ্যে স্বনির্ভর আজকের এই বাংলাদেশে গ্রামীণ কিষাণীদের রয়েছে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। কৃষির মতো সনাতনী খাতেও নতুন বা সম্প্রসারিত ভূমিকা গ্রহণ করেছে নারীরা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতোই একসময় রাজনৈতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে নারী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্বও নিয়েছিলেন। আজ শত সহস্র নারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত সর্বত্র মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে পেশাজীবী এক নারীগোষ্ঠী তৈরি করেছেন। ব্যাংক, কলকারখানায় নারী কাজ করছেন। পোশাকশিল্পে নিয়োজিত কর্মশক্তির ৮০ শতাংশই নারী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় নারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত হচ্ছেন। কূটনৈতিক মিশনে এর মধ্যেই বেশ কয়েকজন নারী নিযুক্ত হয়েছেন। বিভিন্ন পেশায় আরো নারী নিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন মিশনেও বাংলাদেশের নারীরা কাজ করছেন।

নারী উন্নয়নের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি হচ্ছে নারী শিক্ষা ও নারীর প্রশিক্ষণ। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে বেইজিং-পরবর্তী দশকসমূহে বাংলাদেশ শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে, এমনকি এ হার ছেলেদের তুলনায় বেশি। মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে-শিক্ষার্থীর হারও ছেলেদের চেয়ে বেশি (৫২.৩%)। বৃত্তিমূলক শিক্ষায়ও এগিয়ে আসছে মেয়েরা (২৬%)। আগে এ হার ছিল অনুল্লেখযোগ্য। উচ্চশিক্ষা, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষায়ও মেয়েদের হার আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। পাবলিক পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভালো ফল করছে।

বর্তমান সরকারের নেয়া নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণেও উন্নতির ধারা ওপরের দিকে। পারিবারিক, সামাজিক ও নানামুখী সহিংসতা মোকাবিলায় আইন, কেন্দ্রীয় সেল, ডিএনএ ল্যাব প্রতিষ্ঠা, নারী পাচার রোধ, বিভাগভিত্তিক ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর নজরদারি, কাউন্সিলিং হেল্প লাইন ইত্যাদি সরকারের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

মাস্টার কার্ড ইনডেক্সের তথ্য বলছে, ২০১৫ সাল নারীর কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি সাধন করেছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিয়ে পরিচালিত বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায়ও এগিয়েছে বাংলাদেশ।

রপ্তানি খাতের সিংহভাগ রেমিট্যান্স আসছে নারী শ্রমিকের মাধ্যমে। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের নারীরা রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের মতো খাতে বিশাল ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, দেশের সবচাইতে বড় রপ্তানি খাত পোশাকশিল্পের ৮০ শতাংশই নারী।

সার্বিকভাবে লিঙ্গবৈষম্যের দিক দিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ১১১তম, যেখানে পাকিস্তান ১২৩ এবং ভারত রয়েছে ১৩৩ নম্বরে। এই সূচকে এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়। রাজনীতিতে লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস করে আঞ্চলিক নেতৃত্বে সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ মর্যাদাপূর্ণ ওমেন ইন পার্লামেন্টস

(ডব্লিউআইপি) গ্লোবাল ফোরাম অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের জোনাল ক্যাটাগরিতে রাজনীতিতে লিঙ্গবৈষম্য কমিয়ে আনায় অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ এ বিজয় গৌরব অর্জন করে। যা বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সম্মান।

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকেও এগিয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ইউএনডিপি মানব উন্নয়ন সূচকে চলতি বছরে বাংলাদেশ ১৩৯ নম্বরে উঠে এসেছে। ১৮৮টি দেশের মধ্যে আগের বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪২। গতবারের মতো এবারও দ্রুত এগিয়ে চলা ১৮টি দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম। নারী উন্নয়ন, প্রত্যাশিত আয়ু, সাক্ষরতা, শিক্ষা এবং মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে সারা বিশ্বে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে ইউএনডিপি।

নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব পদক্ষেপের ফলে নারী উন্নয়ন গতিশীল হয়ে উঠছে। সর্বস্তরে নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, চাকরির ব্যবস্থা, সমতা-শ্রমে অংশগ্রহণ, নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে অব্যাহত প্রচেষ্টা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ নারীর দক্ষতা বাড়াতে ক্রমাগত দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে বর্তমান সরকার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ জোরদার করার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়। এ কাজে রয়েছে সুষ্ঠু সমন্বয়। ২০৫০ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। অতিদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা কর্মসূচি। কর্মজীবী স্তন্যদায়ী নারীদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিত্তহীন নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ভিজিডি কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ কর্মসূচি ইত্যাদি নারী উন্নয়নে গতি এনেছে। নারীদের কৃষি, সেলাই ব্লক-বাটিক, হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন আয়বর্ধক বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নানা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ, নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান, নারী ও আইন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০, নারী মানবসম্পদ, নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ, জায়গাজমিতে ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ নারীর অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখছে।

নারীর ক্ষমতায়নে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম

পিকেএসএফ ও তার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে নারীর আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক কর্মকাণ্ডসহ নানামুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে টেকসই নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই দেশজুড়ে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত পিকেএসএফ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান মানবতাবাদী অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের চিন্তা ও চেতনায় মানবিক উন্নয়নের নানা কর্মমুখী কার্যক্রমে বদলে যাচ্ছে নগর-গ্রামের নারীরা। কাউকে উন্নয়নের বাইরে রেখে নয় বরং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার মূল দর্শনে সমৃদ্ধ পিকেএসএফ-এর প্রকল্পসমূহ ২৭৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পুরো দেশের সকল গ্রাম ও শহরে ১২.৭১ মিলিয়ন মানুষকে (যার মধ্যে ৯০.৯১ শতাংশই নারীকে) সাথে নিয়ে সব ধরনের বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় এগিয়ে যাচ্ছে পিকেএসএফ। সময়ের প্রেক্ষিতে, বাস্তবতার নিরিখে, স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার বৈচিত্র্যময় কর্মসূচিসমূহের মধ্যে কার্যকর ও লাগসই ঋণ প্রদান, কৃষি, পশু সম্পদ উন্নয়ন, অকৃষি ও সেবাখাতে উদ্যোক্তা তৈরি, কারিগরি সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, স্বল্প আয়ের শহুরে মানুষের জন্য আবাসন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সামাজিক অধিপরামর্শ ও গবেষণা, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদান, মঙ্গা মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগ,

অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষায়িত কার্যক্রম, উদ্ভাবনীমূলক স্থানীয় উদ্যোগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল কার্যক্রমের সাফল্য দৃশ্যমান। বাংলাদেশের যে কোন প্রত্যন্ত জনপদে নারীদের যে বিপুল উৎসবমুখর কর্মযজ্ঞ তার পেছনে সরকারের পাশাপাশি পিকেএসএফ ও তার সহযোগী সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এক নবধারার সূচনা ঘটেছে পিকেএসএফ-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত উন্নয়ন ধ্যান-ধারণাকে একটি মৌলিক কাঠামোর রূপরেখার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র পরিবারসমূহকে লক্ষ্যভুক্ত করে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন উদ্দিষ্ট "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (**সমৃদ্ধি**)" শীর্ষক সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে। পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ ২০১০ সালের গোড়ার দিকে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির কাজ শুরু করে। বর্তমানে দেশের ৬২টি জেলার ১৫৩টি ইউনিয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশেষায়িত আর্থিক সেবা, সঞ্চয়, সামাজিক পুঁজি গঠন, বনায়ন, যুব ও নারী উন্নয়ন, সমৃদ্ধ বাড়ি, প্রবীণ কেন্দ্র, মুক্তিযোদ্ধা সহায়তা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিঘাত মোকাবেলায় সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সকল ইউনিয়নে নারী জাগরণ ও ক্ষমতায়নে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়ন এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের অংশীদারিত্বে এবং বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব খাতের বাজেট থেকে প্রদত্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত **সমৃদ্ধি** একটি দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম।

নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি এবং এগুলোর সম্প্রসারণে সহায়তা দান, উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণে সহায়তা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, অতিদরিদ্র গোষ্ঠীসমূহের জন্য তাদের নিজেদের বাস্তবতার ভিত্তিতে গোষ্ঠী-উদ্দীষ্ট কর্মসূচি এবং যুব জনশক্তির সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতিকে পিকেএসএফ-এর কর্মসূচিসমূহের মৌলিক বিষয় হিসেবে ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

অন্যান্য এনজিওদের ভূমিকা

মহান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকাল থেকে এদেশে বিপন্ন মানুষের পাশে এনজিওদের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। নারী উন্নয়ন, নারীর দক্ষতা ও সামর্থ্যায়ন, নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি কৃষি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে।

নারী উন্নয়নের মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, খাদ্য উৎপাদন, আয় উৎপাদক, গ্রামের সঞ্চয় ও ঋণ গ্রুপ, প্রাতিষ্ঠানিক সুদৃঢ়করণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন সেবা প্রদানের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং একই সাথে নারীর মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সহিংসতাবিরোধী উদ্যোগ গ্রহণ কার্যক্রমে বাংলাদেশে এনজিওদের ভূমিকা অব্যাহত রয়েছে।

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান- সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ: বাংলাদেশের নারীদের বিদ্যমান সঙ্কট

সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি অনুসরণে, বাংলাদেশে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। নারীর জীবন স্বভাবতই সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমরা যদি আমাদের সমাজের অসাম্যের ভেতরের কারণগুলো খুঁজে বের করি তবে দেখব এর পিছনে রয়েছে ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা বর্ণ ও লিঙ্গ বৈষম্য। এই ধরনের ব্যবস্থা নারীদের গতিশীলতা, ভূমিকা এবং যৌন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে নারী পরিবারে তার যথাযথ অবস্থান থেকে বঞ্চিত। সমাজ আশা করে, একজন নারী তাঁর জীবনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে শিশুর জন্মদান এবং শিশু পালনে, পরবর্তী প্রজন্মের অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে বহুসংখ্যক নারীর বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের মাধ্যমে পিতা কন্যার অভিভাবকত্ব স্বামীর কাছে স্থানান্তর করে। শিক্ষার জন্য, চাকরির জন্য, হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য, বিবাহিত মহিলার বাইরে যাওয়ার জন্য তাঁর স্বামী অথবা পিতার কাছ থেকে অনুমতি নিতে

হয়। বাংলাদেশী নারীর গর্ভধারণেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না এবং তাঁকে তাঁর পরিবারে অবস্থান পাকাপোক্ত করতে হয় ছেলে সন্তান জন্ম দেবার মাধ্যমে। সাধারণভাবে, পরিবারের প্রধান হিসাবে স্বামী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশ গ্রহণ করে। ৫০ বছর বয়সে পৌঁছানো নারীদের মধ্যে, বাংলাদেশে চারজনের মধ্যে একজন নারী তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা। সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিধবাদের এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য পুনর্বিবাহ নিরুৎসাহিত করে। এ সকল নারীদেরকে পরিবারের প্রধান হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য শ্রম বাজারে প্রবেশ করতে হয়। আশার কথা এই যে, ক্রমবর্ধমানভাবে, নারীরা গার্হস্থ্য বিষয় এবং বাইরের উভয় বিষয়ে আরো সক্রিয় হয়ে উঠছে।

কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিতে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মহিলারা অনেক পিছিয়ে। পরিবারের মহিলা সদস্যদের আধুনিক চিকিৎসাসেবা গ্রহণের হার কম এবং তারা সাধারণত প্রথাগত ও সস্তা পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণের ওপর নির্ভর করে। মেয়েদের পুষ্টির অবস্থা ছেলেদের চেয়ে অনেক খারাপ।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, যৌতুক এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মতো ক্ষতিকারক ও বৈষম্যমূলক আচরণগুলি এখনো বিদ্যমান। সামাজিকভাবে পরিবার ও বহির্জগতে পুরুষরা নারী অপেক্ষা অধিক মূল্য পেয়ে থাকে। সহিংসতা ঘরে, কর্মক্ষেত্রে এমনকি সাধারণ্যেও দৃশ্যমান।

দেখা যাচ্ছে, সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে নারীর অগ্রগতি ভূমিকা রাখলেও এখনও বৈষম্যের শিকার নারীরা। নারীদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে সহিংসতাকে মোকাবেলা করেই। যৌন নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, আত্মহত্যা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনসহ নারীর প্রতি সহিংসতা কিন্তু বেড়েই চলেছে। নারী নির্যাতন থেমে নেই। নারীর প্রতি সহিংসতা ও পারিবারিক নির্যাতন এবং নারী পাচার চলছেই। ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা, যৌতুকের বলি হওয়ার ঘটনা এখনো উদ্বেগের পর্যায়ে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) নারী নির্যাতন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের জরিপেও উঠে এসেছে যে, নারীরা ঘরেই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হচ্ছে। এতে বলা হয়েছে, নারীরা বাইরে থেকে নিজ ঘরে অনেক বেশি নির্যাতিত হন। জরিপ অনুযায়ী, বিবাহিত মেয়েদের ৮৭ শতাংশ নির্যাতনের শিকার নিজ ঘরে স্বামীর দ্বারা। ৮১.৬ শতাংশ নারী স্বামীগৃহে মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন ৬৪.৬ শতাংশ। নারী অধিকার নিয়ে যারা কাজ করেন তাঁদের মতে, পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুক, এসিড সন্ত্রাস, ধর্ষণ, বাল্যবিবাহ, পাচার, কর্মক্ষেত্রে হয়রানিসহ নানা ধরনের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন প্রণীত হলেও সেসব আইনের বাস্তবায়নে দুর্বলতা রয়েছে।

বর্তমানে সহিংসতার নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে (যেমন, মোবাইল ফোন), নারীর প্রতি সহিংসতার নতুন রূপ দেখতে পাচ্ছি আমরা। আইন এবং নীতির প্রয়োগের অভাব একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। সাধারণ নারী ও পুরুষের মধ্যে আইনি ও নীতি বিধান তথ্য এবং বোঝার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জটিল এবং প্রলম্বিত আইনী প্রক্রিয়া নারী এবং দরিদ্রদের জন্য ব্যয়বহুল এবং তা সুবিচার অলভ্য করে তোলে। সামাজিক নিয়মগুলি আইনি প্রবিধানের প্রয়োগকে প্রভাবিত করে এবং কখনও কখনও ন্যায্য ফলাফল প্রাপ্তিতে বাধা দেয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মানবাধিকার সম্পর্কিত কাঠামো কার্যকর করার জন্য আরো জবাবদিহিতা প্রয়োজন।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) সমাপ্তির পর ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত একটি টেকসই বৈশ্বিক রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ১৭টি অভীষ্ট চিহ্নিত করে এসডিজি গৃহীত হয়। এসডিজির ৫ নম্বর অভীষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, নারী ও কন্যাশিশুর সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারী আজও পরিবার ও সমাজের প্রতি স্তরে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার। এমনকি আমাদের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার অঙ্গীকার বিবৃত হলেও ব্যক্তি স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, নাগরিক,

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রেও নারীর মানবাধিকারের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটছে না। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের নারী ব্যবসা ও আইন-২০১৬ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশের নারীরা এখনও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার।

শ্রমবাজারের যেসব কাজে উঁচুমাত্রার দক্ষতা দরকার, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে নারী শ্রম বাজারের সেই অংশে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে না। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে নারীর চলাচল সহজ না হওয়ায় পেশাদার জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারছে না। ব্যাংকগুলো নারীকে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অন্যান্য তথ্যভাণ্ডারে নারীর প্রবেশাধিকার সীমিত।

নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরির ব্যবধান এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং নারী পুরুষের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বেতন পায়। নারীর দক্ষতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা দেশে এবং বিদেশে কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত নয়। কিছু পেশায় নিয়োজিত হওয়া থেকে মহিলাদের নিরুৎসাহিত করা হয় কাজের ঐতিহ্যগত বিচ্ছেদের কারণে। চাকরির বাজারে নারীদের নিরুৎসাহিত করে এমন কিছু কারণ যেমন শিশু যত্ন, পরিবহন, বাসস্থান, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা অপ্রতুল সুবিধা যথাযথ কাজের পরিবেশের অভাব নারী উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এখনও একটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন সহজলভ্য হয়নি। শ্রম আইনে নারী অধিকার সীমিত, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশুর প্রযত্ন ইত্যাদি ক্ষেত্র এখনো সমস্যা জর্জরিত।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ দূষণের শিকার বাংলাদেশ। মাত্র ১৩.২০ শতাংশ জমিতে গাছ রয়েছে। লবণাক্ততা, আর্সেনিকের মাত্রা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা নিরাপদ পানীয় জল দূষিত হয় এবং মহিলাদের ওপর এর প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি। জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন এ্যাকশন প্ল্যান একটি বহুমুখী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশমন ও অভিযোজনের জন্য দেশের প্রচেষ্টার ফলে উচ্চতর স্থিতিশীলতা দূরীকরণের ক্ষতি হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নারীদের ওপর সর্বাধিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সবচাইতে বিপদাপন্ন নারীরা।

মুক্ত করো ভয়, আপনা-মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়

পথের বাধা সরাতে হবে– নারীদের উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে

পরিবার এবং সমাজে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে নারী-পুরুষের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষা, আয়, অংশীদার পছন্দ, উত্তরাধিকার আইন, সম্পত্তির অধিকার, সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রক্রিয়া নির্ধারণ, ব্যবসা বা রাজনীতিতে নেতৃত্বের অবস্থানগুলিতে নারীর অবস্থান নড়বড়ে? নারীমুক্তির জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয়, নাগরিক এবং সকল পথ-মতের মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা ও ঐক্যের।

নারীদের সার্বিক মুক্তির অভিযাত্রাকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা সময়ের দাবি।

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান দৃশ্যমানকরণ: ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, ৯১ লাখ নারী গৃহস্থালির কর্মে নিয়োজিত। কিন্তু নারীর এই নিরন্তর অবদান প্রায়ই রয়ে যায় মূলধারার অগোচরে। বাংলাদেশে নারীদের গৃহস্থালীর কাজের অর্থমূল্য হিসাব করা হয় না। এটা করা গেলে অর্থনীতিতে নারীর অবদান আড়ালে থেকে যেত না। উপরন্তু, জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) অনেক বেশি হতো।

২. মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ: মজুরি দেয়ার ক্ষেত্রেও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। পুরুষের চেয়ে নারীদের কম মজুরি দেয়া হয়। সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, নারী দিনমজুরেরা পুরুষের সমান কাজ করেও মজুরি কম পান। পুরুষ দিনমজুরেরা পান গড়ে ১৮৪ টাকা, নারীরা পান ১৭০ টাকা। অনতিবিলম্বে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩. ভূমিজ ও আর্থিক সম্পদে নারীর অভিগম্যতা সৃষ্টি: নারী-পুরুষ সমতার একটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগে সমান অধিকার এবং নিজের শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরি অর্জন করতে পারা। কিন্তু আমাদের বিদ্যমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ও আইনি কাঠামো বৈষম্যমূলক হওয়ায় সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগে নারীর প্রবেশগম্যতা সীমিত। উপরন্তু বাল্যবিবাহের কারণে পারিবারিক উৎস থেকে সম্পদ প্রাপ্তির অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী বঞ্চিত হয়। সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্যের সঙ্গে লিঙ্গবৈষম্য যোগে নারী তুলনামূলকভাবে অধিক দারিদ্র্য ও ক্ষমতাহীনতার শিকার। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে ৭০ শতাংশ নারী ভূমিজ ও আর্থিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক গতিধারায় সম্পদ কেন্দ্রীকরণের প্রবণতার কারণে নারী-পুরুষ সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে, যদি আশু পদক্ষেপ গৃহীত না হয়।

৪. নারী উন্নয়নের পথে বড় বাধা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা: পুরুষতন্ত্র উগ্র হয়ে উঠলেই এ ধরনের সহিংসতা দেখা দেয়। কিন্তু এ-সংক্রান্ত মামলা করার ব্যাপারে যেমন নিরুৎসাহিত করা হয়, তেমনি পুলিশও দুর্বল, ত্রুটিপূর্ণ দায়সারা গোছের চার্জশিট প্রদান করে। আর দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার কারণে নির্যাতনকারী পার পেয়ে যায়। অনেক সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে থাকা নারীও ধর্ষণের শিকার হয়। এ বিষয়ে কঠোর মনিটরিং থাকা প্রয়োজন।

৫. নারী মানবাধিকার কমিশন গঠন: নারীদের আইনের আশ্রয় সুনিশ্চিতকরণে, ন্যায়বিচার তথা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথকভাবে নারী মানবাধিকার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

৬. জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ, পানি ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি: নারীই হচ্ছে পরিবেশের মূল পরিচর্যাকারী ও রক্ষক। বিগত দশকগুলোতে পরিবেশের সঙ্গে তাই নারীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নারীর চাহিদার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে সরকার। জাতীয় বনায়ন প্রকল্পে নারীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনাতেও নারী অংশ নিচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ, পানি ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৭. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা: দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ থেকে দুর্যোগ পরিস্থিতি থেকে জ্ঞান আহরণ, প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারে উন্নতি করেছে। নারীরা বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যথেষ্ট শক্তি প্রদর্শন করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের যুগপৎ অভিযোজন এবং শোষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৮. **যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ:** সরকার-এনজিও ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগে এলাকাভিত্তিক Plan of Action প্রণয়ন করে এবং আইন, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও অধিপরামর্শের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

৯. অ-কৃষিখাতে নারীদের উদ্যোগগুলোকে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান: ইতোমধ্যে বাংলাদেশে অ-কৃষিখাতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল উদ্যোক্তাকে বাজার, কারিগরি দক্ষতা, সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ ও সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা প্রয়োজন।

১০. কন্যাশিশুদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ: আজকের কন্যাশিশুই হচ্ছে আগামী দিনের নারী। কন্যাশিশুর উন্নয়ন তাই উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলাদেশে কন্যাশিশুর উন্নয়নে ক্রীড়া, সংস্কৃতি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন, ক্রীড়া ফেডারেশনের অধীনে জেন্ডার সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, বাল্যবিবাহ রোধে গণপ্রচারণা ও জন্মনিবন্ধন আইন শক্তিশালী করা এবং ইমাম প্রশিক্ষণ, কন্যাশিশুকে জেন্ডার সচেতন করে তোলা এবং শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য টিভিসহ গণপ্রচার, বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের

ব্যবস্থা, ইভটিজিং প্রতিরোধে আইনের সংস্কার এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচারের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

১১. গণমাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ: গণমাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য নিয়ে প্রতিবেদন অনুযায়ী (২০১৫) নারী গুরুত্ব পায় মাত্র ১০ শতাংশ সংবাদে। আমাদের গণমাধ্যমকে আরও নারীবান্ধব হতে হবে এবং সব পরিসংখ্যানে নারীর অবদানকে দৃশ্যমান এবং প্রচারমুখর করতে হবে।

১২. নিরাপদ চলাচল ব্যবস্থা: শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার জন্য এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নারীদের নিরাপদে চলাচলের সুবিধার্থে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. নারী বান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা: সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মান বাড়ানো এবং এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী ও নারীবান্ধব বিভিন্ন বিষয় যোগ করতে হবে।

১৪. নারীদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি: সরকারি স্বাস্থ্যসেবার আওতা ও মান বাড়ানো এবং ডাক্তার ও নার্সদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা, বিশেষ করে, তাঁদের কাছে নারীরা যেন যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সেবা পান, সেটার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১৫. বাস্তবতার নিরিখে কর্মসূচি গ্রহণ:
সরকার/এনজিওদের নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম একটা পূর্বনির্ধারিত ছকে সকল এলাকার জন্য অভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন না করে, স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে বৈচিত্র্যময় ও কার্যকর কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া প্রয়োজন।

১৬. সমন্বয় ও যৌথ অংশীদারিত্ব: তৃণমূল পর্যায়ে সরকার, স্থানীয় সরকার, সামাজিক সংগঠন ও এনজিওদের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক ও কৌশলগত সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সকলে সম্মিলিতভাবে নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

১৭. জেন্ডার সমতাকে বিবেচনায় নেয়া: উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শুধু নারীদের প্রতি মনোযোগ যেমন প্রয়োজন, তেমনই এই প্রক্রিয়ায় কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরও আরো অধিক হারে সম্পৃক্ত করে তাদের মধ্যে লিঙ্গীয় বিষয়াদিতে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে।

১৮. নারীদের নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি: স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনসমূহের সভা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা ও জেন্ডার সচেতনতা বাড়াতে হবে, যাতে নারীরা সহজভাবে কথা বলতে ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বাচ্ছন্দ্যে অংশ নিতে পারেন।

উপসংহার

বাংলাদেশে নারীর অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। সীমাবদ্ধতাসমূহের উত্তরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশ পৌঁছে যাবে তার সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে হয়ে উঠবে নারী পুরুষের সমতা, সমানাধিকারে বলীয়ান বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশে। পরিশেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি চরণের মাধ্যমে নারীর জন্য সুদৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি–

> "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
> সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
> মুক্ত করো ভয়, আপনা-মাঝে শক্তি ধরো,
> নিজেরে করো জয়।
> দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
> নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
> মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিতে ভর না
> রেখো সংশয়"।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮
সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা

ক্র.নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
১	রাজিয়া সুলতানা	জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট
২	মেরী বেগম	ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
৩	মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন	পাবনা প্রতিশ্রুতি
৪	রোকেয়া বেগম	উন্নয়ন বিকল্পের নীতি-নির্ধারণী গবেষণা (উবিনীগ)
৫	লুৎফন নাহার	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র
৬	নাছিমা বেগম	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
৭	আমজাদ হোসেন	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৮	ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান	ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
৯	শাহরিমা জামান	ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন
১০	সাবরিনা শারমিন	আরডিআরএস
১১	মোঃ গোলাম মোস্তফা	দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা
১২	রাবেয়া নাজনীন	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
১৩	মাহমুদা আক্তার	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
১৪	মোঃ দেলোয়ার ইসলাম	ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
১৫	মনোয়ারা বেগম	প্রত্যাশী
১৬	হেলাল উদ্দিন	প্রত্যাশী
১৭	মোঃ মশিউর রহমান	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)
১৮	মোঃ শফিউল্লাহ শোভন	পিদিম ফাউন্ডেশন
১৯	মোঃ সেলিম হোসাইন	বৈশাখী টিভি
২০	সুলতানা রাজিয়া	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র
২১	অপূর্ব রায়	সেন্টার ফর মাস এডুকেশন সায়েন্স (সিএমইএস)

ক্র.নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
২২	মজিবুর রহমান	শরীয়তপুর ডেভেপলমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)
২৩	লিটন মিয়া	ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন
২৪	বেগম রোকেয়া	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
২৫	আশরাফুন নাহার	দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা
২৬	স্বপ্না রেজা	মানবিক সাহায্য সংস্থা
২৭	সোহেলিয়া নাজনীন	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্ (এসডিআই)
২৮	মোঃ সামসুল আলম	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)
২৯	মোঃ আরিফুর রহমান	বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ
৩০	সাইদা খান	সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
৩১	তারিক সৈয়দ হাসান	Coastal Association for Social Transformation Trust (Coast Trust)
৩২	ড. নিলুফার বানু	বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ
৩৩	আসমা বেগম	শক্তি ফাউন্ডেশন
৩৪	আবিদা সুলতানা	এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অফ কমিউনিটি হেলথ-এডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)
৩৫	গাউস পিয়ারে মুক্তি	Work for Better Bangladesh Trust
৩৬	নুসরাত জাহান	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী
৩৭	ডাঃ তানিয়া আলম	বিআইএমএএস
৩৮	তানভিয়া রোসলিন	মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন
৩৯	খালেদা সামস্	পল্লী বিকাশ কেন্দ্র
৪০	শিউলি আক্তার	পরশমনি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
৪১	জেসমিন সুলতানা	নারী মৈত্রী
৪২	হোসনে আরা আক্তার	নারী মৈত্রী
৪৩	মাহবুবা পান্না	তথ্য মন্ত্রণালয়
৪৪	পূর্ণিমা রানী	তথ্য মন্ত্রণালয়
৪৫	বেলায়েত হোসেন	হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল
৪৬	নাজনীন কবির	Work for Better Bangladesh Trust
৪৭	ড. প্রতিমা পাল মজুমদার	পিকেএসএফ
৪৮	মোঃ বদিউল আলম	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুয়র (ডরপ)
৪৯	হামিদা বেগম	সোশ্যাল আপলিফটমেন্ট সোসাইটি

ক্র.নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
৫০	শরফুদ্দিন	অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই)
৫১	নাজনীন আহমেদ	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ
৫২	ফারাহ মুনির	এসআরএ
৫৩	ফাহরিতা খান	সাজিদা ফাউন্ডেশন
৫৪	নাজনীন চৌধুরী	প্রোগ্রামস ফর পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট
৫৫	মোহাম্মদ আবু হানিফ	ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
৫৬	মোঃ আব্দুল কাদের	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ
৫৭	মেরিনা আক্তার	কেয়ার ফর মাদার এন্ড চিলড্রেন ফাউন্ডেশন
৫৮	ফারজানা মাহমুদ	প্র্যাকটিকাল এ্যাকশন
৫৯	আলেয়া আক্তার	এসইউএস
৬০	মোসাঃ নাজমা খাতুন	এসএমই ফাউন্ডেশন
৬১	তানজিনা নুর জিনিয়া	ব্র্যাক
৬২	ইকবাল আহম্মদ	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
৬৩	জাহিন রায়হান	ঢাকা টাইমস
৬৪	রিফাত রহমান	বিডি নিউজ ২৪ ডট কম
৬৫	নিলু হাসনাত	ডিবিসি নিউজ
৬৬	শুভ খান	সময় টিভি
৬৭	মাহবুব	সময় টিভি
৬৮	আজমল এইচ সরকার	বিটিভি
৬৯	মোঃ মেহেদী আল-আমিন	বিটিভি
৭০	আবুল খায়ের	বেতার
৭১	সায়দুল ইসলাম রনি	ডিবিসি নিউজ
৭২	শরিফ	বিটিভি
৭৩	শাওন হাসনাত	দীপ্ত টিভি
৭৪	জাকির হোসাইন	দৃষ্টিসুর
৭৫	আশিফ মোহাম্মদ অভি	বিডি নিউজ ২৪ ডট কম
৭৬	অর্পণ	এনপিএস নিউজ টিভি
৭৭	বুশরা	সাজিদা ফাউন্ডেশন
৭৮	নাইলা জামান	সাজিদা ফাউন্ডেশন
৭৯	ফেরদৌসি বেগম	উদ্দীপন

পল্লী
কর্ম-সহায়ক
ফাউণ্ডেশন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯১২৬২৪০-৩, ৮৮০-২-৯১৪০০৫৬-৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
www.pksf-bd.org
facebook.com/pksf.org